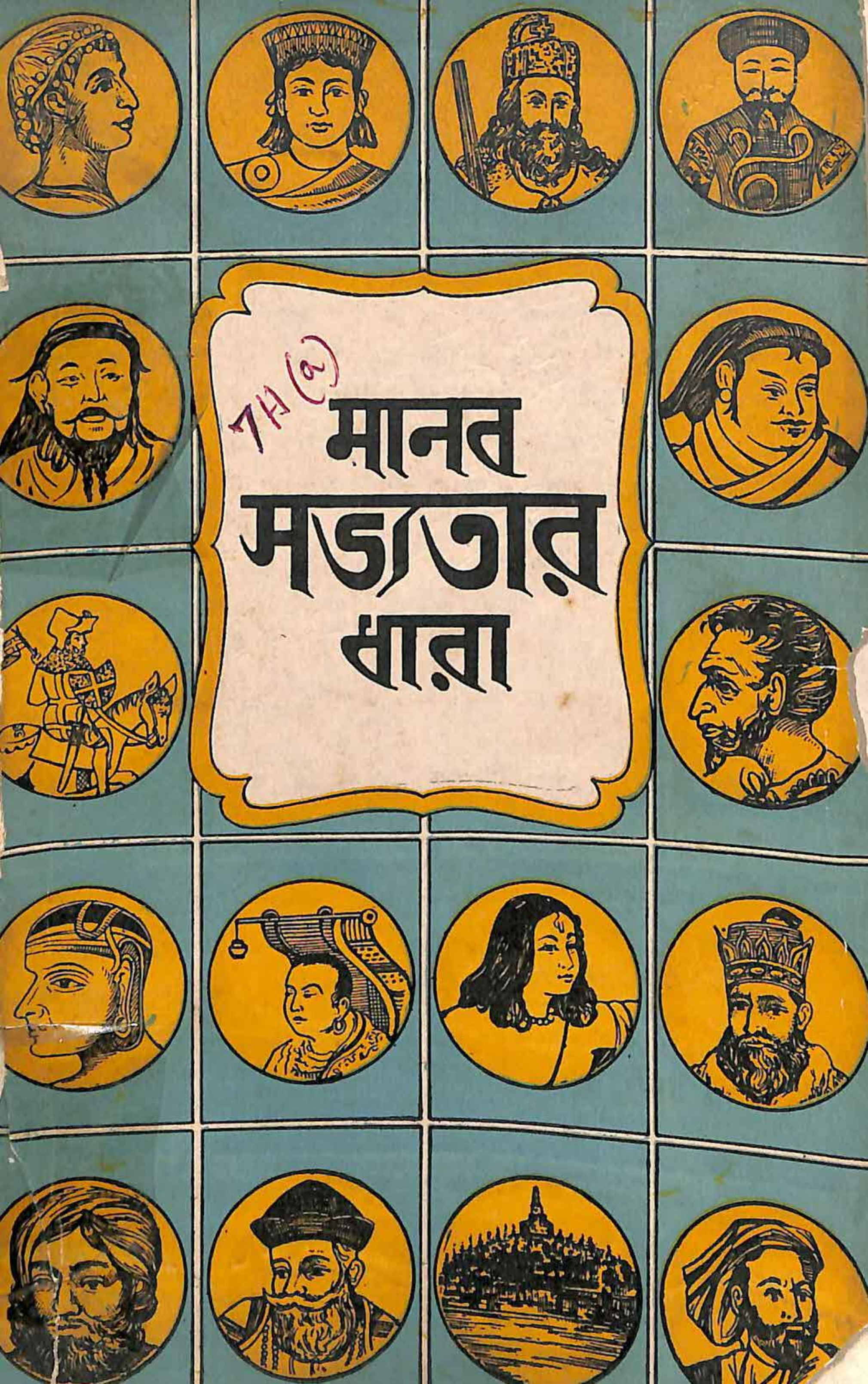
মানব সভ্যতার ধারা



[Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on History for Class VII. Vide Notification No. T. B. VII/H/81/18. Dated 8. 11. 81]

মানব-সভ্যতার ধারা

[মধ্যযুগ ঃ সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

অশোক প্রকাশন
এ৬১-৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৮০
সংশোধিত সংস্করণ : জানুয়ারি, ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৮২
চতুর্থ সংশোধিত সংস্করণ : জানুয়ারি, ১৯৮৫

মূল্য : তের টাকা মাত্র

অশোক প্রকাশন এ ৬১-৬২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা সাত হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শক্তি প্রেস ১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন কলিকাতা ছয় হইতে শ্রীএককড়ি ভড় কর্তৃক মুদ্রিত

বিষয়-সূচী

———

মধ্যযুগ শব্দের অর্থ ১

১. ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা

মধ্যযুগ শব্দের অর্থঃ নানা আঁকাবাঁকা পথে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে মানব-সভ্যতার ধারা। তার কিছু বিবরণ তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েছ। তোমরা পড়েছ, সেই গুহা-মানবের যুগ থেকে মানুষ কিভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে রোম সাম্রাজ্যের যুগে এসে পৌঁছেছিল।

কিন্তু এই রোম সাম্রাজ্যের যুগ-ও স্থায়ী হয়নি। মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ও সমাজে নানা পরিবর্তন এসেছিল। পরবর্তী কালেও ঐরকম পরিবর্তন এসেছে উৎপাদন-ব্যবস্থায় ও সমাজে।

এইসব পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রেই মানব-সভ্যতার ধারাকে প্রধান তিনটি কালে বা যুগে ভাগ করা হয়েছে: **প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ।**

ইউরোপে মধ্যযুগের আরম্ভকালঃ রোম সাম্রাজ্য খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ব ও পশ্চিম, এই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্ব-ভাগের রাজধানী ছিল বাইজান্‌টিয়াম বা কন্‌স্টান্টিনোপল, আর পশ্চিম-ভাগের রাজধানী ছিল রোম। হূণজাতি ও জার্মান উপজাতি-গুলির আক্রমণ এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও অধঃপতনের ফলে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতন হয়েছিল। এই ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই ইউরোপে প্রাচীন যুগ শেষ ও মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল বলা হয়। অবশ্য, এ-রকম সন-তারিখ দিয়ে কোনও যুগের সূচনা চিহ্নিত করা যায় না। বলা ভালো, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল।

২. ইউরোপে মধ্যযুগের পরিবর্তন

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য : সাধারণত দেখা যায়, মধ্যযুগে মানুষ তার জীবন ও ধনসম্পদের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা হারিয়েছিল এবং নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার সন্ধানে একে অন্যের দাসে ও প্রভুতে পরিণত হয়েছিল ; কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ছিল দুর্বল ; সামন্ত-প্রভুদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল ; কৃষি ও শিল্পে স্বাধীন কৃষক ও কারিগরের সংখ্যা নগণ্য হয়ে পড়েছিল ; কৃষক ও কারিগররা পরিণত হয়েছিল ভূমিদাসে ; পথঘাট বিনিষ্ট হয়েছিল বা দস্যু-তস্করের জন্য বিপজ্জনক ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় লোপ পেয়েছিল ; মানুষের জীবন গ্রামে ও অঞ্চলেই ছিল সীমাবদ্ধ ; ধর্মসংস্থাগুলির প্রাধান্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল ; মানুষের মনে যুক্তির চেয়ে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস প্রবল ছিল।

মধ্যযুগীয় অবস্থার পরিবর্তন : কিন্তু এই অবস্থাতেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে থাকে। উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে—ভূমিদাসরা ক্রমেই স্বাধীন কৃষক ও কারিগরে পরিণত হয় ; শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। মানুষ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ছেড়ে ক্রমেই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত হতে থাকে। ধর্মীয় সংস্থাগুলির প্রাধান্য হ্রাস পায় ; স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পায় ; মুদ্রণ-ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটে। মানুষ নব নব উদ্ভাবনায় ও প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়। নূতন নূতন ভৌগোলিক আবিষ্কার ঘটে, মানুষের সামনে নবদিগন্ত খুলে যায়। ভাষার ভিত্তিতে নতুন নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে। সামন্ততন্ত্র দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। গড়ে ওঠে নতুন নূতন জাতি, নূতন নূতন দেশ ও রাষ্ট্র।

মধ্যযুগের অবসান : এইসব পরিবর্তন মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের আগমন সূচনা করে। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য প্রায় হাজার বছর টিকে ছিল। অবশেষে, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, কন্‌স্টান্টিনোপল অটোমান তুর্কীদের অধিকারে গেলে তা-ও লোপ পেল। এই ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দকে ইউরোপে

মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের আরম্ভের কাল বলে ধরা হয়। তবে মধ্যযুগের শেষকেও এইভাবে সন-তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তাই খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান হয়েছিল, বলা চলে।

৩. অন্যান্য স্থানে মধ্যযুগ

ভারতে মধ্যযুগ ঃ কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গায় মধ্যযুগের আরম্ভ একই সময়ে ঘটেনি। শেষও ঘটেনি একই সময়ে। রোম সাম্রাজ্যের উপর যেমন হূণ আক্রমণ হয়েছিল, ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ওপরও তেমনি হূণ আক্রমণ হয়েছিল। হূণ আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যকে কঠিন আঘাত হেনেছিল। এর অল্পকাল পরেই অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিরাক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল। দেশে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল। এই সময়েই ভারতে মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল বলে ধরা হয়।

ইউরোপে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের অবসান হয়েছিল। ভারতে মধ্যযুগ যে আরো অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বলা চলে, ভারতে মধ্যযুগ মুঘল আমল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

মধ্যযুগের কাল ও রূপের ভিন্নতা ঃ কোথাও কোন সুনির্দিষ্ট সময়ে মধ্যযুগের আরম্ভ বা অবসান হয়েছিল বলা ঠিক নয়। কারণ, সমাজ-ব্যবস্থা ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে আমরা মধ্যযুগ বা আধুনিক যুগ বলি, তা কোথাও হঠাৎ ঘটেনি —ধীরে ধীরে ঘটেছিল। ফলে একটি যুগ আর একটি যুগে পরিণত হ'তে দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

সব জায়গায় মধ্যযুগীয় সমাজের রূপও যে একই ছিল, তাও নয়। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মধ্যযুগের ভারতীয়, মঙ্গোলীয় বা তুর্কী সমাজ-ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন জায়গায় সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারা ও মানও একরূপ ছিল না।

অনুশীলনী

১। কবে থেকে ইউরোপে মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল বলা হয় ?

২। কবে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান হয়েছিল বলা হয় ?

৩। মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি ? ঐ যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?

৪। মধ্যযুগের অবসান কিভাবে হয়েছিল ?

৫। পৃথিবীর সকল জায়গায় মধ্যযুগের শুরু ও শেষ কি একই সময়ে হয়েছিল ? ভারতে কবে মধ্যযুগের স্থচনা হয়েছিল ? কবে শেষ হয়েছিল ?

৬। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — খ্রীষ্টাব্দকে ইউরোপে মধ্যযুগের স্থচনার কাল বলে ধরা হয়। (খ) — খ্রীষ্টাব্দকে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানের কাল বলে ধরা হয়। (গ) সমাজ ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন বিচার ক'রে ইতিহাসকে — যুগে ভাগ করা হয়েছে ; — যুগ, — যুগ ও — যুগ।

৭। ঠিক অংশের নিচে দাগ দাও :

(ক) মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য রাজতন্ত্র/গণতন্ত্র/সামন্ততন্ত্র।

(খ) মধ্যযুগে ক্রীতদাসরা/ভূমিদাসরা/স্বাধীন কৃষক ও শ্রমিকরা উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রধান অংশ নিত।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) ইতিহাসের কালকে প্রধান কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে ? ঐ যুগগুলি কি কি ?

(খ) ইউরোপে মধ্যযুগ কত খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে বলা হয় ?

(গ) ইউরোপে মধ্যযুগ কত খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়েছে বলা হয় ?

(ঘ) ভারতে কবে থেকে মধ্যযুগ শুরু হয়েছে বলে ধরা হয় ?

(ঙ) ভারতে মধ্যযুগ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল বলা চলে ?

ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা

১

জার্মান উপজাতিসমূহ ও হূনজাতি

জার্মান উপজাতিসমূহঃ রোম সাম্রাজ্য উত্তরে রাইন নদী ও দানিয়ুব নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাইন নদী ও দানিয়ুব নদীর উত্তরে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি বাস করত। রোমানদের তুলনায় এরা ছিল অসভ্য ও দুর্ধর্ষ। তাই রোমানরা এদের বলত বর্বর। এই উপজাতিগুলির মধ্যে প্রধান ছিল গথ, ভাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, আলেমানি, স্যাক্সন, লোম্বার্ড প্রভৃতি। গথরা আবার প্রধান দু ভাগে বিভক্ত ছিল— ভিসি-গথ (পশ্চিমা-গথ) ও অষ্ট্রো-গথ (পূর্বী-গথ)।

জার্মান উপজাতিসমূহের সমাজ ও জীবনযাত্রাঃ এই জার্মান উপজাতিগুলি ছিল আর্য জাতিরই অন্য এক শাখা। তবে তখনও এরা গ্রীক, পারসিক, ভারতীয় বা রোমান আর্যদের মতো সভ্যতার উচ্চ স্তরে পৌঁছেনি। এরা বনে-ঘেরা এদিকে-ওদিকে-ছড়ানো গ্রামগুলিতে বাস করত। গ্রামগুলিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রামের চারদিকে থাকত প্রাচীর। এরা এদের বাড়ি-গুলিকে ঘাস-খড় ও লতাপাতা দিয়ে ছাইত, জন্তু-জানোয়ারের চামড়া, লোম ও সুতো দিয়ে তৈরি পোশাক পরত। শিকার, পশুপালন ও সামান্য চাষ-আবাদ ছিল এদের প্রধান জীবিকা।

এরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসী ছিল। বর্শা, তরবারি ও তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। ঢাল ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে এদের সুখ্যাতি ছিল। এরা দলপতির আদেশ পালনের জন্য যে কোন বিপদের সম্মুখীন হ'ত, অবহেলায় প্রাণ দিত।

এদের সমাজ সম্ভ্রান্ত, স্বাধীন জনসাধারণ ও ক্রীতদাসে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি পরিবার নিয়ে গড়ে উঠত এক-একটি গ্রাম। গ্রামকে বলা হ'ত মার্ক, বা ডফ,। গ্রাম-পরিচালনার জন্য থাকত

স্বাধীন জনসাধারণের একটি সমিতি। এই সমিতিকে বলা হ'ত মুট। এইরকম কতকগুলি গ্রামে বাস করত এক-একটি উপজাতি। উপজাতিগুলি তাদের মধ্য থেকে একজনকে দলপতি নির্বাচিত করত। দলপতির আদেশ-পালন তাদের কাছে ছিল পবিত্র কর্তব্য।

আর্য জাতির অন্যান্য শাখাগুলির মতোই তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা ক'রে তাদের পূজো করত। এদের আকাশ-দেবতা ছিলেন ওডন্। তিনিই ছিলেন দেবরাজ। পৃথিবী-দেবতা ছিলেন হার্থা, যা থেকে ইংরেজিতে Earth শব্দটি এসেছে। বজ্রের দেবতা ছিলেন থর বা ডনর। উৎপাদনী-শক্তির দেবী ছিলেন ফ্রিয়া। এরা সূর্যকে দেবীরূপে এবং চন্দ্রকে দেব-রূপে কল্পনা করেছিল। এদের সূর্যদেবী ছিলেন সুন্না ও চন্দ্রদেব ছিলেন মানি। এ থেকেই ইংরেজিতে Sun ও Moon শব্দ এসেছে। অমঙ্গলের দেবতা ছিলেন সোটের—আমরা যাকে বলি শনি।

এইসব দেবদেবীর অনেকের নাম আমরা আজও ইংরেজি বারের নামগুলির মধ্যে পাই। সূর্যদেবী (সুন্না) থেকে সান্‌ডে (রবিবার); চন্দ্রদেবতা (মানি) থেকে মান্‌ডে (সোমবার); যুদ্ধের দেবতা টিউ থেকে টিউস্‌ডে (মঙ্গলবার); ওডন থেকে ওয়েন্‌স্‌ডে (বুধবার); থর থেকে থার্সডে (বৃহস্পতিবার); ফ্রিয়া থেকে ফ্রাইডে (শুক্রবার); সোটের থেকে স্যাটারডে (শনিবার)।

হূনজাতি ঃ হূনরা ছিল মঙ্গোল জাতির লোক। এরা মধ্য-এশিয়ায় বাস করত। ঘোড়া ছিল এদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এরা ঘোড়ায় চড়ত, ঘোড়া দিয়ে গাড়ি টানাতো, ঘোড়ার দুধ ও মাংস খেত। ঘোড়ার চামড়া দিয়ে ছাউনি তৈরি করত। এরা ছিল যাযাবর। এরা গ্রীষ্মকালে ঘুরে বেড়াত, আর শীতকালে কোথাও থাকবার মতো জায়গা খুঁজত। এদের যা কিছু সম্বল বা সম্পদ, এরা ঘোড়ার পিঠে বা ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। তাই এদের কাছে জমি, চাষ-আবাদ বা ঘর-বাড়ির কোনও মূল্য ছিল না। এদের প্রধান জীবিকা ছিল লুণ্ঠন।

এরা ছিল অত্যন্ত হিংস্র ও দুর্ধর্ষ ; দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে পঙ্গপালের মত এক-একটি জনপদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস চালাত। এদের দয়ামায়া ব'লে কিছু ছিল না ; এরা শত্রুদের হয় হত্যা করত, নয় ক্রীতদাসে পরিণত করত। সভ্য জগতের কাছে এরা ছিল 'ঈশ্বরের অভিশাপ'।

হূনরা প্রায়ই চীনদেশে হানা দিত। কিন্তু হান্-বংশীয় সম্রাটদের সময়ে চীনদেশে হানা দেওয়া কঠিন হ'লে এরা ক্রমেই দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হ'তে থাকে। এরা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মধ্য-ইউরোপে পৌঁছে। এদের আক্রমণের চাপে জার্মান উপজাতিগুলি ক্রমেই আরো দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং রোমের কাছে আশ্রয় চায়। গথরা দানিয়ুব নদী পার হয়ে রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়ে।

২. রোম সাম্রাজ্যে জার্মান ও হূন আক্রমণ

গথদের রোম সাম্রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার : অ্যালারিক : হূনদের চাপে গথরা রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়লে সম্রাট ভালেন্স তাদের রোম সাম্রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা ও সম্রাটের কর্মচারীরা তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে থাকায় তারা বিদ্রোহী হয় এবং তাদের সঙ্গে রোম সম্রাটের যুদ্ধ বাধে। দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী ও বর্মপরিহিত গথদের হাতে আদ্রিয়ানোপলের যুদ্ধে সম্রাট ভালেন্স পরাজিত হন। ফলে রোম সাম্রাজ্যে গথদের প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

গথদের মতোই অন্যান্য জার্মান উপজাতির লোকেরাও রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিল। এরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হওয়ায় রোম সম্রাটরা এদের প্রায়ই সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করতে থাকেন। অনেক সময় জার্মানরা রোমান সৈন্যবাহিনীতে প্রতাপশালী সেনাপতির পদও লাভ করত। রোম সম্রাট থিওডোসিয়াস স্টিলিকো নামে একজন ভ্যাণ্ডাল-জাতীয় সেনাপতিকে ইতালি ও প্যানোনিয়ায়

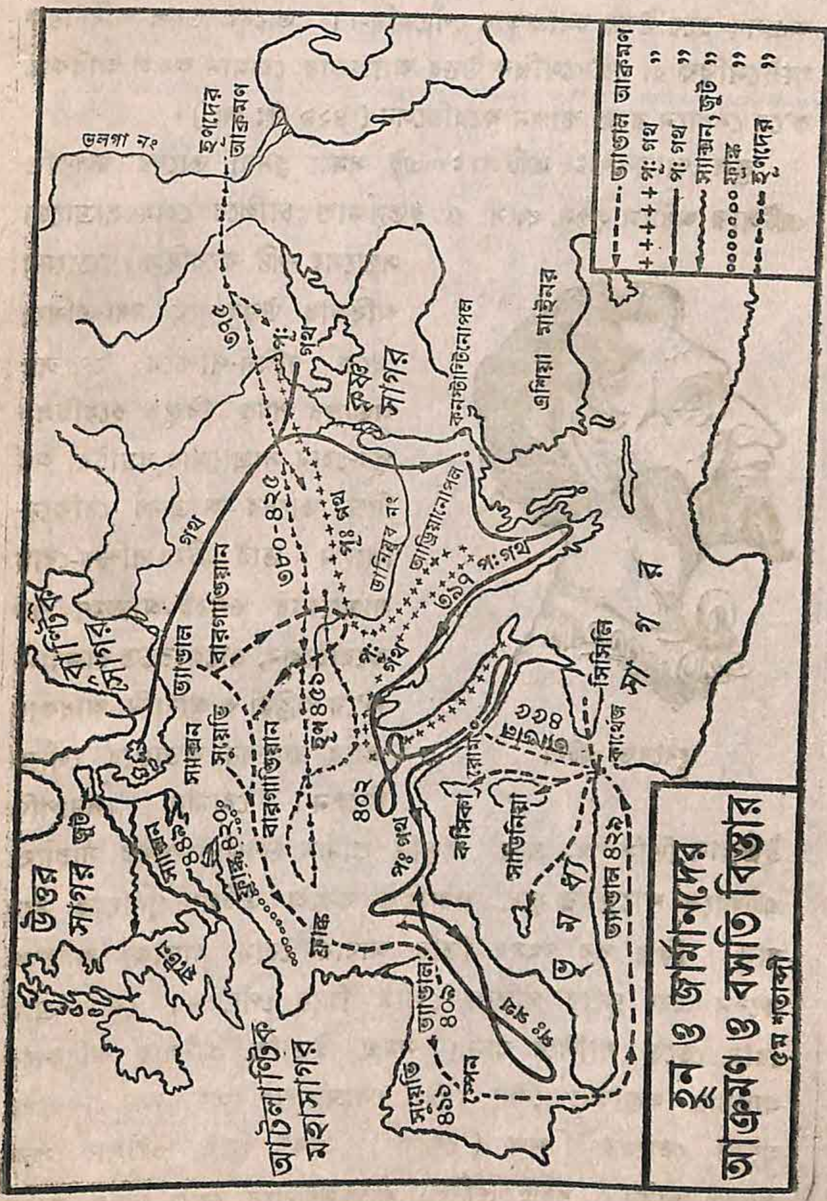
(বর্তমান অষ্ট্রিয়ায়) এবং অ্যালারিক নামে একজন ভিসিগথ-জাতীয় সেনাপতিকে বল্‌কান উপদ্বীপে রোমান সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যু হ'লে অ্যালারিক কন্‌স্টান্টিনোপলে থিওডোসিয়াসের এক পুত্র আর্কাডিয়াসকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে সমর্থন করতে থাকেন। অন্যপক্ষে ষ্টিলিকো থিওডোসিয়াসের অপর পুত্র হনোরিয়াসকে রোমের সিংহাসনে বসিয়ে তাঁকে সমর্থন জানান। আর্কাডিয়াস ও হনোরিয়াস অ্যালারিক ও ষ্টিলিকোর হাতের পুতুলমাত্র ছিলেন। অ্যালারিক ও ষ্টিলিকো রোম সাম্রাজ্যে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করলে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে অ্যালারিক পরাজিত হন।

ষ্টিলিকোর প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়। তাতে সন্দিগ্ধ হয়ে সম্রাট হনোরিয়াস তাঁকে হত্যা করেন। ষ্টিলিকো এইভাবে নিহত হ'লে সমস্ত জার্মান উপজাতির সেনারা অ্যালারিকের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অ্যালারিক ইতালি আক্রমণ ক'রে লুণ্ঠন করেন (৪২০ খ্রীঃ অঃ)। গথরা ইতিপূর্বেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাই অ্যালারিক রোমের গির্জাগুলিকে লুণ্ঠন ও ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি দেন। অ্যালারিক দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ইতালির অধিকাংশ অধিকার করেন। এই সময়ে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

ভিসি-গথরা পরে ইতালি থেকে বিতাড়িত হয়। তারা দক্ষিণ গলে (দক্ষিণ ফ্রান্সে) ও স্পেনে অধিকার বিস্তার করে।

অন্যান্য জার্মান উপজাতিগুলির প্রাধান্য বিস্তার ঃ গাইসেরিক ঃ হূন আক্রমণের চাপে অন্যান্য জার্মান উপজাতিগুলিও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। অ্যালারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে রোমান সৈন্যবাহিনী সরিয়ে আনার ফলে জার্মান উপজাতিগুলি সেখানে সহজে অধিকার বিস্তার করেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম গলে ভিসি-গথ, দক্ষিণ-পূর্ব গলে বারগাণ্ডিয়ান এবং উত্তর গলে ফ্রাঙ্ক্ উপজাতিগুলি রাজ্য স্থাপন করেছিল।


হূন ও জার্মানদের
আক্রমণ ও বসতি বিস্তার
৫ম শতাব্দী
ভ্যাণ্ডাল আক্রমণ
পূঃ গথ
পঃ গথ
স্যাক্সন, জুট
ফ্রাঙ্ক
হূণদের
উত্তর সাগর
বাল্টিক সাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
কৃষ্ণ সাগর
ভলগা নং
হূণদের আক্রমণ
কনস্টান্টিনোপল
এশিয়া মাইনর
দানিয়ুব নং
সিসিলি
কার্থেজ
রোম
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
স্পেন
ফ্রাঙ্ক
গথ

ভ্যাণ্ডালরা পূর্ব জার্মানি থেকে বর্তমান ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছেছিল। তাদের তরুণ অধিনায়ক গাইসেরিক বা জেনসেরিক উত্তর আফ্রিকার রোমান অঞ্চল অধিকার ক'রে সেখানে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন (৪২৯ খ্রীঃ অঃ)।

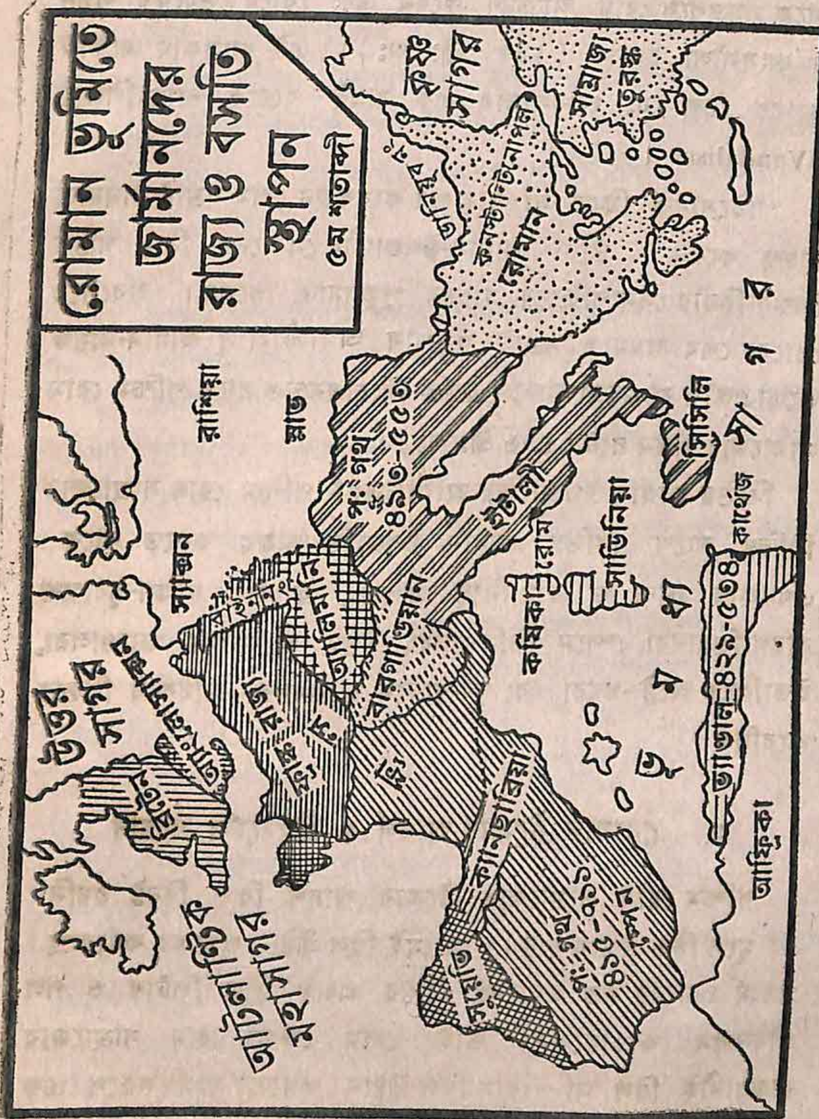
হূন আক্রমণঃ এটিলাঃ এই সময়ে হূনরা তাদের দলপতি এটিলার অধীনে লুণ্ঠন, ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে রোম সাম্রাজ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তাদের অধিকার উত্তর-পূর্বে মধ্য-এশিয়া থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ফ্রান্সের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটরা অর্থ দিয়ে তাদের আক্রমণ ঠেকিয়েছিলেন। তাই এটিলা পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের ওপরই আক্রমণ শুরু করেছিলেন, হাঙ্গেরিতে রাজধানী ক'রে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানি অধিকার ক'রে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে পৌঁছেছিলেন। রোমান সেনাপতি



হূননেতা এটিলা

ইটিয়াস ভিসি-গথ, ফ্রাঙ্ক্ প্রভৃতি জার্মান উপজাতিগুলির সাহায্যে এটিলাকে শালোঁর যুদ্ধে পরাজিত করলে এটিলা পূর্বদিকে সরে যান। কিন্তু পর বৎসর তিনি আবার রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং দুর্বার গতিতে রোমে গিয়ে পৌঁছেন। রোম সম্রাট রোম ছেড়ে পালিয়ে যান। সমগ্র ইতালি এটিলার অধিকারে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সাম্রাজ্যর এই মহা বিপদের মুহূর্তে রোমের বিশপ (পোপ) প্রথম লিও এটিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হঠাৎ এটিলা শান্তিপূর্ণভাবে রোম ত্যাগ করেন (৪৫২ খ্রীঃ অঃ)। কি কারণে এটিলা এভাবে রোম ত্যাগ করেছিলেন, তা রহস্যময়। পর বৎসর (৪৫৩ খ্রীঃ অঃ) এটিলার

মৃত্যু হলে হূনরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা অল্পকাল মধ্যে জার্মান উপজাতিগুলির দ্বারা ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয়। অনেকে



স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। হাঙ্গেরি (Hungary) নামটি আজও তাদেরই স্মৃতি বহন করেছে।

ভ্যাণ্ডাল আক্রমণ ঃ রোমের পতন ঃ রোম থেকে এটিলা চলে যাওয়ার দু বছরের মধ্যেই ভ্যাণ্ডাল-নায়ক গাইসেরিক আফ্রিকা থেকে সমুদ্রপথে রোম আক্রমণ করেন এবং রোমে ভয়ংকর লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চালান (৪৫৫ খ্রীঃ অঃ)। এই ধ্বংসকার্য এতোই ভয়াবহ ছিল যে, ধ্বংসলীলার এক নামই হয়েছে ভ্যাণ্ডালিজম্ (Vandalism)।

গাইসেরিক ফিরে যাওয়ার পর কয়েকজন রোম সম্রাট নামমাত্র রাজত্ব করেন। তাঁরা জার্মান-উপজাতীয় সেনাদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিদের হাতের পুতুলমাত্র ছিলেন। অবশেষে রোমের শেষ নামমাত্র সম্রাট রমুলাস অগাস্টালাস জার্মান-নায়ক ওডোএকার বা ওডোভাকার কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হ'লে পশ্চিম রোম সামাজ্যের পতন ঘটে (৪৭৬ খ্রীঃ অঃ)।

বিভিন্ন জার্মান উপজাতির আধিপত্য ঃ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি রাজত্ব করতে থাকে। এখনকার ফ্রান্স ও জার্মানিতে ফ্রাঙ্করা, ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বারগাণ্ডিয়ানরা, স্পেনে ভিসি-গথরা, উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডালরা, ইতালিতে অস্ট্রো-গথরা এবং পূর্ব-বৃটেনে স্যাক্সনরা অধিকার বিস্তার করেছিল।

৩. রোমান ঐক্যের আদর্শ ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের ঐক্যের আদর্শ কিন্তু বিনষ্ট হয়নি। এর মূলে ছিল খ্রীষ্টান চার্চ। রোমেই ছিল খ্রীষ্টান জগতের কর্মকেন্দ্র। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য এখানেই খ্রীষ্টের প্রধান শিষ্য পিটার ও পল জীবনদান করেছিলেন। তাই রোম কেবল রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীই ছিল না—রোম ছিল খ্রীষ্টান জগতের মর্মস্থলরূপে এক অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত নগর। গথরা পূর্বেই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। অন্যান্য জার্মান উপজাতিগুলিও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল। শেষ পর্যন্ত প্রায় সকলেই রোমান চার্চের অনুগত হয়েছিল।

রোমান চার্চ কেবল ধর্মীয় সংস্থাই ছিল না। তা ছিল রোম সাম্রাজ্যের অতীত ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও আইন-শৃঙ্খলার ধারক ও বাহক। রোমান আইন-কানুনই সুদীর্ঘকাল ইউরোপীয় শাসন-ব্যবস্থা, বিধি-বিধান ও ন্যায়ের আদর্শ ছিল। পরবর্তীকালে রোমান চার্চ রোম সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিল। ফলে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও রোমান চার্চের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্যের ঐক্যের ও আইন-কানুনের আদর্শ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। জার্মান উপজাতিগুলি বলতে কি বোঝ? এরা কোথায় বাস করত? এরা মানব জাতির কোন্ মূল শাখার অন্তর্গত? এদের বর্বর বলা হ'ত কেন?

২। জার্মান উপজাতিগুলির সমাজ ও রাজনৈতিক সংগঠন কেমন ছিল?

৩। হূনজাতির আদি-বাসস্থান কোথায় ছিল? এদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? সভ্য মানুষ এদের 'ঈশ্বরের অভিশাপ' বলত কেন?

৪। হূন জাতি দক্ষিণ-পশ্চিমে কেন অগ্রসর হয়েছিল? এরা দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়ার ফলে কি ঘটেছিল?

৫। রোম সাম্রাজ্যের উপর হূন আক্রমণ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। ভিসি-গথদের রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ, বসতিবিস্তার ও রাজ্য স্থাপন সম্পর্কে কি জান?

৭। ভ্যাণ্ডাল উপজাতির রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ, বসতিস্থাপন ও অধিকার-বিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৮। বিভিন্ন জার্মান উপজাতিগুলির রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ, বসতিস্থাপন ও অধিকার বিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৯। অ্যালারিকের নেতৃত্বে ভিসি-গথদের রোম সাম্রাজ্যে অধিকার বিস্তারের বিবরণ দাও।

১০। গাইসেরিকের নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডালদের রোম সাম্রাজ্যে অধিকার বিস্তারের বিবরণ দাও।

১১। এটিলার নেতৃত্বে হূনদের রোম সাম্রাজ্যে অভিযানের বিবরণ দাও।

১২। কত খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতন ঘটেছিল? ঐ সময় রোমের সম্রাট কে ছিলেন? তিনি কিভাবে সিংহাসনচ্যুত হন?

১৩। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও রোম সাম্রাজ্যের ঐক্যের ও আইনের আদর্শ কিভাবে স্থায়ী হয়েছিল?

১৪। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) জার্মান উপজাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের উত্তরে—ও— নদীর ওপারে বাস করত। তারা ছিল — জাতির অন্য এক শাখার লোক। তারা রোমানদের তুলনায় অসভ্য, দুর্ধর্ষ ও হিংস্র ছিল ব'লে তাদের বলা হ'ত —।

(খ) জার্মান উপজাতিগুলির আকাশ-দেবতা ছিলেন —, বজ্রের দেবতা ছিলেন —, পৃথিবী-দেবতা ছিলেন —, সূর্যদেবী ছিলেন —, চন্দ্র-দেবতা ছিলেন —, উৎপাদনী-শক্তির দেবতা ছিলেন —, অমঙ্গলের দেবতা ছিলেন—।

(গ) হূনরা ছিল—জাতির লোক। এদের আদি-বাসস্থান ছিল — —। — বংশীয় সম্রাটদের সময়ে চীনদেশে হানা দেওয়া কঠিন হ'লে এরা — দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। এদের নেতা—রোম আক্রমণ করেন।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

(ক) কত খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল?

(খ) কোন্ জার্মান উপজাতীয় নেতা শেষ রোম সম্রাটকে সিংহাসন-চ্যুত করেছিলেন?

(গ) শেষ রোম সম্রাটের নাম কি?

(ঘ) হূনরা কার নেতৃত্বে রোম অধিকার করেছিল?

(ঙ) ভিসি-গথরা কার নেতৃত্বে রোম অধিকার করেছিল?

(চ) ভ্যাণ্ডালরা কার নেতৃত্বে রোম লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছিল?

(ছ) কত খ্রীষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয়?

(জ) ষ্টিলিকো কে ছিলেন?

(ঝ) কোথাকার যুদ্ধে এটিলা পরাজিত হয়েছিলেন?

(ঞ) যে রোমান সেনাপতি এটিলাকে পরাজিত করেছিলেন, তাঁর নাম কি?

ইউরোপে তথাকথিত অন্ধকারের যুগ ৩

১. খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী—তথাকথিত 'অন্ধকারের যুগ'

অন্ধকারের যুগ বলা হয় কেন ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ-ভাগে জার্মান উপজাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, রোমের সৈন্যবাহিনীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, এবং রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ শুরু করেছিল। সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। কন্স্টান্টাইন ও থিওডোসিয়াসের মতো দক্ষ সম্রাটরা রোম সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা কিছুটা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হলেও তা সাময়িক মাত্র ছিল। এই সময় রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছিল এবং জার্মান উপজাতীয় নায়ক ও সেনাপতিরা রোম সাম্রাজ্যের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে উঠেছিল।

রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের জীবন ও ধন-সম্পদ্ বিপন্ন ও অনিশ্চিত ছিল। যুদ্ধে ও গৃহযুদ্ধে রোম সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। জার্মান উপজাতীয় নায়ক ও সরকারী কর্মচারীদের শোষণ ও লুণ্ঠন জনজীবনে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংসলীলা ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার।

এই অবস্থায় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক ভয়ংকর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য হূন আক্রমণ ও জার্মান উপজাতীয়দের প্রাধান্য থেকে কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছিল। ৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল এবং পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য এখন বর্বর জার্মান উপজাতিগুলির লীলাভূমি হয়ে উঠেছিল। ফলে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি টিকে থাকলেও পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যে—অর্থাৎ সাম্রাজ্যের ইউরোপীয়

অংশে—তা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে ফ্রাঙ্ক্‌রা শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করলে পুনরায় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ও শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হয়।

তাই খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীকে অনেকে বলেছেন—'অজ্ঞতার যুগ' বা 'অন্ধকারের যুগ'।

প্রকৃতপক্ষে অন্ধকারের যুগ নয় কেন ঃ কিন্তু এই সময়টাকে প্রকৃত 'অন্ধকারের যুগ' বলা যায় না। চতুর্থ শতাব্দীতেই সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন খ্রীষ্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি দেন। সম্রাট থিওডোসিয়াসও খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক বিস্তারে সহায়তা করেন। এই সুবিশাল সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচার এক যুগান্তকারী ঘটনা। রোমান সমাজ যে বীভৎস বিলাস-ব্যসন ও হিংস্র আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিল, রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচার রোমান সমাজকে তা থেকে মুক্ত করে। রোমান সমাজ এক অভূতপূর্ব মানবিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়। বর্বর জার্মান উপজাতিগুলি একে একে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এই নব চেতনা ও মানবিকতাবোধ বিস্তারের যুগকে কোনমতেই অন্ধকারের যুগ বলা যায় না।

ঐ যুগে যে অনিশ্চয়তা ও নিরপত্তার অভাব দেখা দিয়েছিল, তা শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অন্তরায় ছিল সত্য। কিন্তু ঐ যুগে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা একেবারে বন্ধ হয়েছিল, তা-ও নয়। ঐ যুগে খ্রীষ্টান গির্জা ও মঠগুলি শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তারে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় এক অভাবনীয় ভূমিকা নিয়েছিল। বিশেষত, মঠগুলিতে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা শত শত দুষ্প্রাপ্য পুঁথিকে অমূল্য রত্নের মতো সযত্নে সংরক্ষিত ক'রে রেখেছিলেন। ঐ যুগে মুদ্রণ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তাই হস্তলিখিত পুঁথিই ছিল শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম। মঠবাসী সন্ন্যাসীরা ঐসব মূল্যবান পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। এইভাবে ঐ যুগে তাঁরা কেবল খ্রীষ্ট-ধর্মশাস্ত্র-গুলিকে নয়, গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য-দর্শনকেও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তারে

সচেষ্ট ছিলেন। সেদিক থেকেও এই যুগকে অন্ধকারের যুগ বলা চলে না।

তাছাড়া, পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলিতে ঐ সময় শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ও জ্ঞানানুশীলন ব্যাহত হ'লেও পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য ঐ সময়ে শিল্প-সাহিত্যে ও জ্ঞানানুশীলনে যথেষ্ট উন্নত ছিল।

২. ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ও সভ্যতার বিকাশে চার্চের দান

হূন ও বর্বর জার্মান উপজাতিগুলির আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ায় যে অনৈক্য. অরাজকতা ও অন্যায় অবিচার দেখা দিয়েছিল, তার হাত থেকে খ্রীষ্টান চার্চই দেশকে রক্ষা করেছিল। খ্রীষ্টধর্ম রোম সম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ায় রোম সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান চার্চের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যে রোমই ছিল খ্রীষ্টান চার্চের প্রধান কর্মকেন্দ্র। রোমের বিশপই ছিলেন পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান সংস্থাগুলির সর্বময় কর্তা। তাঁকে বলা হ'ত পোপ। পোপ শব্দের অর্থ পিতা। খ্রীষ্টান অধিবাসীরা সকলেই চার্চের অনুগত ছিল। বিজয়ী বর্বর জার্মান উপজাতিগুলিও একে একে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং রোমান চার্চের অনুগত হয়েছিল। ফলে সকলেই রোমান চার্চের শাসন ও অনুশাসন মেনে চলত। রোমান চার্চ রোমান আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির রক্ষকরূপে দেখা দিয়েছিল। রোমান চার্চ পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেমন একটি ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি তা ধর্মীয় অনুশাসন এবং রোমান রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতি মেনে চলতে সকলকে বাধ্য করায় অরাজকতা ও অন্যায়-অবিচারের হাত থেকে দেশ রক্ষা পেয়েছিল। তা সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের সহায়ক হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। খ্রীষ্টয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীকে অন্ধকারের যুগ বলা হয় কেন? তা কি সত্যই অন্ধকারের যুগ ছিল?

২। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কাল ইউরোপে অন্ধকারের যুগ ছিল না—কি কি কারণে একথা বলা যায়?

৩। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষণে ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারে খ্রীষ্টান চার্চ ও মঠগুলির ভূমিকা কি ছিল?

৪। খ্রীষ্টান চার্চ কিভাবে অনৈক্য, অরাজকতা ও অন্যায়-অবিচার দূরীকরণে ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল?

বাইজান্‌টাইন সভ্যতা ৪

১. কন্‌স্টাণ্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা : রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে খ্রীষ্ট-ধর্মের স্বীকৃতি

কন্‌স্টাণ্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা : বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্য : রোম সাম্রাজ্য পূর্বে মেসোপটেমিয়া থেকে পশ্চিমে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজধানী রোম থেকে এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কঠিন হয়ে উঠেছিল। সীমান্ত-রক্ষাও সহজ ছিল না। কারণ পারস্য এবং জার্মান উপজাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। এই অসুবিধা লক্ষ্য ক'রে কোন কোন সম্রাট ইতিপূর্বে রোম ছেড়ে উত্তর ইতালির বিভিন্ন শহরে গিয়ে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সম্রাট কন্‌স্টাণ্টাইন-ও (খ্রীঃ অঃ ৩০৬-৩৩৭) এইসব অসুবিধা লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণ সাগরের মুখে বস্‌ফোরাস প্রণালীর কাছে প্রাচীন গ্রীক নগর বাইজান্‌টিয়ামে রোম সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপনের

সংকল্প করেন। কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ায় সামরিক ও বাণিজ্যিক, তু' দিক থেকেই বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখান থেকে স্থলপথে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা যেমন সহজ ছিল, তেমনি সহজ ছিল শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করা।

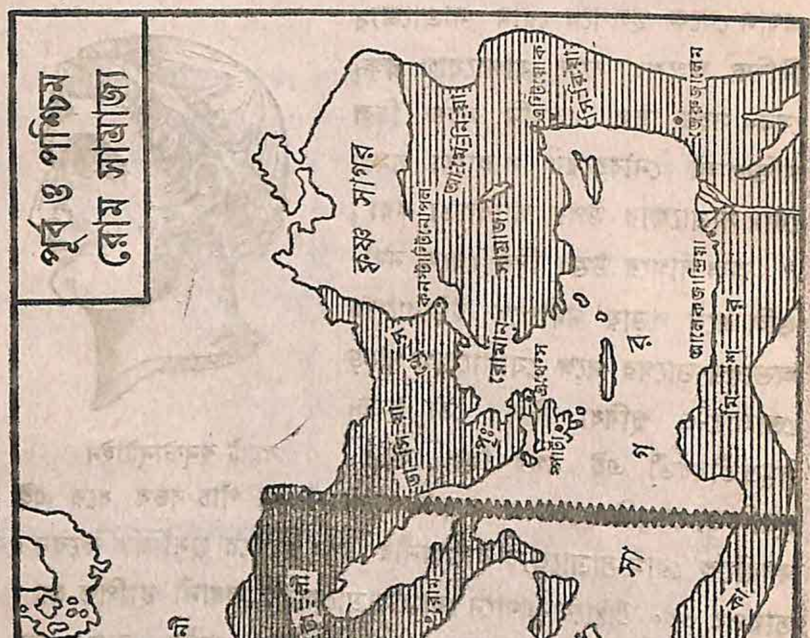

সম্রাট কন্স্টান্টাইন

কৃষ্ণ সাগরে উত্তর দিক থেকে নদীগুলি এসে পড়ায় নদীপথে ইউরোপের অভ্যন্তর-ভাগের সঙ্গে যোগাযোগ গ'ড়ে তোলার-ও সুবিধা ছিল। তা ছাড়া সমুদ্রতীরবর্তী এই নগর ছিল যেমন সুরক্ষিত, তেমনি তুর্ভেদ্য। সম্রাট কন্স্টান্টাইন পাঁচ বছর ধরে এই নগরীকে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীর উপযুক্ত করে সুসজ্জিত করেন। তারপর ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। কন্স্টান্টাইন নিজের নাম অনুসারে এই নগরীর নাম দেন **কন্স্টান্টিনোপল**। এই শহরের বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল।

এইভাবে রোম সাম্রাজ্যে তুটি রাজধানী গ'ড়ে ওঠে—পূর্ব অংশের রাজধানী হয় কন্স্টান্টিনোপল ; পশ্চিম অংশের রাজধানী থাকে রোম। সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যু হ'লে (খ্রীঃ অঃ ৩৯৫) রোম সাম্রাজ্য তাঁর তুই পুত্র—আর্কাডিয়াস ও হনোরিয়াসের মধ্যে বিভক্ত হয়। আর্কাডিয়াস কন্স্টান্টিনোপল থেকে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য ও হনোরিয়াস রোম থেকে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতন হ'লে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়। কিন্তু এর পরও হাজার বছর পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য টিকে থাকে। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যই বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি ঃ সম্রাট কন্স্টান্টাইনের অপর কীর্তি খ্রীষ্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের রাষ্টীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি

দান। সম্রাট কনস্টান্টাইনের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপল খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কন্‌স্টান্টিনোপল এবং পূর্ব-রোম



সাম্রাজ্যের অন্যান্য বহু নগর সুরম্য গির্জায় সুশোভিত হয়। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমকেই খ্রীষ্টধর্মের প্রধানতম কেন্দ্র মনে

করা হ'ত। রোমের বিশপই ছিলেন পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্মযাজক। রোমেই যিশু খ্রীষ্টের পার্শ্বচর শিষ্য সেণ্ট পিটার ও সেণ্ট পল শহীদ হয়েছিলেন। তাই রোমের বিশপ নিজেকে তাঁদের উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্টান জগতের সর্বময় কর্তা ব'লে মনে করতেন। কিন্তু কন্‌স্টান্টিনোপলের বিশপ বা প্যাট্রিয়ার্ক রোমের বিশপ বা পোপের এই প্রাধান্য স্বীকার করতেন না। ফলে রোম সাম্রাজ্যের দুই অংশের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রাধান্য নিয়ে বিরোধ চলত।

পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যে ল্যাটিন ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। তাই পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থা ল্যাটিন চার্চ বা রোমান ক্যাথলিক (বিশ্বজনীন) চার্চ নামে পরিচিত ছিল। অন্য পক্ষে, পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে গ্রীক ভাষা, গ্রীক সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। তাই পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্থা গ্রীক চার্চ নামে পরিচিত ছিল।

২. সম্রাট জাস্‌টিনিয়ান

জাস্টিনিয়ান: রোমের পতনের একান্ন বছর পরে এক শক্তিধর সম্রাট বাইজান্‌টিয়ামের সিংহাসনে আরোহণ করেন (২৭ খ্রীঃ অঃ)। এঁর নাম জাস্টিনিয়ান। ইনি ৫২৭ থেকে ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

জাস্টিনিয়ান বাইজান্‌টিয়ামের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তাঁর কাকা জাস্টিনের সহযোগিরূপে দেশ-শাসনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর কাকা জাস্টিন সেনাপতি থেকে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন। যখন জাস্টিনিয়ান বাইজান্‌টিয়ামের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি ছিলেন তেজস্বী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি তাঁর জীবনে সাফল্যের জন্য দুজনকে সহায়করূপে পেয়েছিলেন—তাঁর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী থিওডোরা এবং তাঁর সেনাপতি বেলিসেরিয়াস। সম্রাজ্ঞী থিওডোরা প্রথম জীবনে অভিনেত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও দৃঢ়চেতা রমণী

ছিলেন। বেলিসেরিয়াস ছিলেন প্রথম জীবনে একজন সাধারণ সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি একটি যুদ্ধে সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিশাল পারসিক বাহিনীকে পরাজিত ক'রে সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেন এবং অল্পকালের মধ্যে জাস্টিনিয়ানের দক্ষিণহস্ত হয়ে ওঠেন।

রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা: জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ ক'রে রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে সংকল্প করেন। প্রথমেই তিনি জার্মান-বিজিত পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হন।

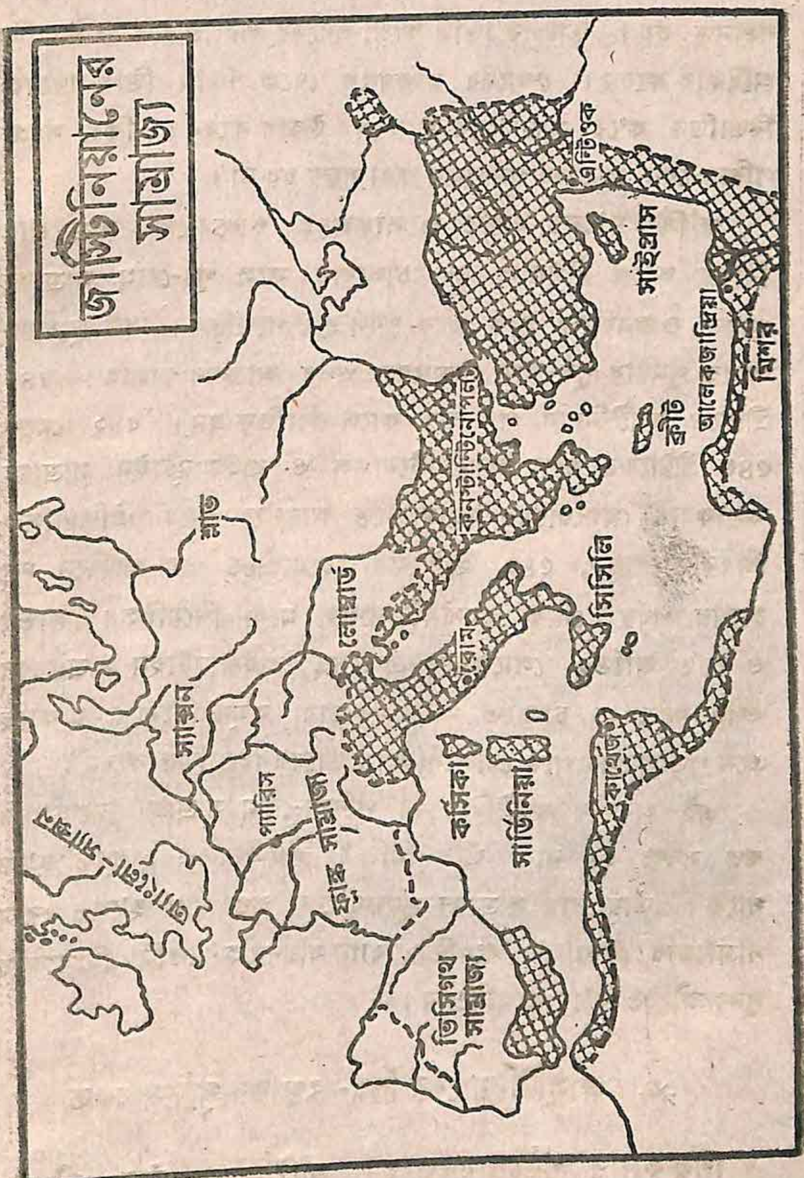
ঐ সময়ে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের পূর্বে পারস্য সাসানীয়-বংশীয় শাসকদের অধীনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং ক্রমাগত প্রতিবেশী পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খসরব পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে হানা দিলে জাস্টিনিয়ানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে।



সপারিষদ সম্রাট জাস্টিনিয়ান

কিন্তু ঐ সময় জাস্টিনিয়ান পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তাই তিনি খসরবের সঙ্গে সন্ধি করেন (৫৩৩ খ্রীঃ অঃ)।

পারস্যের সঙ্গে সন্ধি ক'রেই জাস্টিনিয়ান পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য



পুনরুদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সময়ে উত্তর আফ্রিকার রোমান অঞ্চল ভ্যাণ্ডালদের অধিকারে ছিল। জাস্টিনিয়ান

ভ্যাণ্ডালদের পরাজিত ক'রে উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেন। সিসিলি, সার্দিনিয়া, কর্সিকা প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলিও তাঁর পদানত হয়। তারপর তিনি অস্ট্রো-গথদের পরাজিত ক'রে ইতালি অধিকার করেন। স্পেনের দক্ষিণাংশ থেকে তিনি ভিসি-গথদের বিতাড়িত ক'রে সাম্রাজ্যের ঐ অংশও উদ্ধার করেন। কিন্তু সমগ্র পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

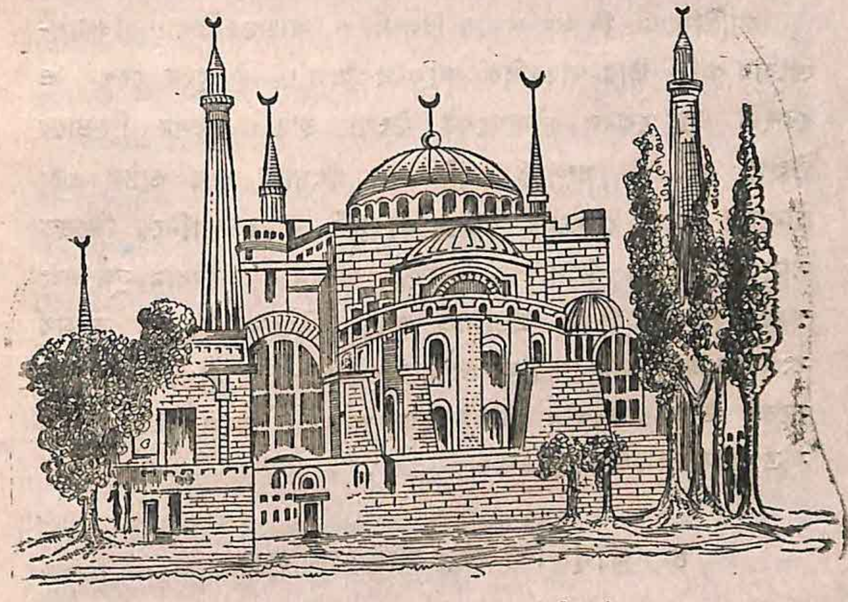
জাস্টিনিয়ানের ব্যর্থতা ও সাফল্য: পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাবার ফলে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য ধনবল ও জনবলের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে পারস্য পুনরায় পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালায়। ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান পারস্যের কাছে পরাজিত হন। ৫৪২ থেকে ৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কন্‌স্টান্টিনোপল ও বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্য কয়েকবার প্লেগরোগের মহামারীতে আক্রান্ত হয়। ঐতিহাসিক গিবন বলেছেন, ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামারীতে এক-একদিনে দশ হাজার পর্যন্ত লোক কন্‌স্টান্টিনোপলে মারা গিয়েছিল। আভর ও স্লাভ জাতির লোকেরাও ক্রমাগত বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের ওপর আক্রামণ চালাতে থাকে। তারা কন্‌স্টান্টিনোপলের কাছে এসে পড়লে সেনাপতি বেলিসেরিয়াস তাদের বিতাড়িত করেন।

এই অবস্থায় জাস্টিনিয়ানের পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন সফল হয় না। তাঁর বিজিত অঞ্চলগুলিও হস্তচ্যুত হ'তে থাকে। তাঁর রোম সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন ব্যর্থ হ'লেও রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতির ধ্যান-ধারণাকে তিনি নিঃসন্দেহে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলেছিলেন।

৩. জাস্টিনিয়ানের শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

শিল্প-কলার পৃষ্ঠপোষকতা: জাস্টিনিয়ান তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধে কাটালেও শিল্পকলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপলকে সুরম্য প্রাসাদে-

গির্জায় ও গ্রন্থাগারে সুশোভিত করেছিলেন। সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরেও তিনি বহু প্রাসাদ ও গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপলে যে সান্ট সোফিয়া গির্জা নির্মাণ করেছিলেন, তার বিশালতা, গঠনসুষমা ও কারুকার্য আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই গির্জার মধ্যস্থলে স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি প্রকাণ্ড গম্বুজ আছে। গম্বুজটির ব্যাস ১০৮ ফুট এবং মেঝে থেকে উচ্চতা ১৮০ ফুট। স্তম্ভগুলির পাশে আছে ২১৬ ফুট দীর্ঘ স্থানের উপর নির্মিত দুটি অপেক্ষাকৃত অনতি-উচ্চ অর্ধগম্বুজ। গির্জাটির অভ্যন্তরভাগ বিচিত্রবর্ণ মর্মরে খচিত এবং গাঢ় নীল ও সোনালি রঙের বর্ণবিচিত্র কাচ দিয়ে রচিত মোজেইকে অলংকৃত।



সান্টা সোফিয়া গির্জা (এখন মসজিদ)

জাস্টিনিয়ান স্থাপত্যশিল্পে যে নির্মাণ-পদ্ধতি ও শিল্পশৈলী ব্যবহার করেছিলেন, তা দীর্ঘকাল ইউরোপে স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শ-রূপে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এই স্থাপত্যরীতি মুসলিম স্থাপত্য-রীতিকেও প্রভাবিত করেছিল।

জাস্টিনিয়ান চিত্রকলারও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐ সময়ে বহু সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। জাস্টিনিয়ানের বিশাল গ্রন্থাগারে যে সকল পুঁথি রক্ষিত ছিল, সেগুলির পাণ্ডুলিপি ও অনুলিপি সুন্দর সুন্দর চিত্রে সুশোভিত ছিল। মোজেইক রচনার শিল্প অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের অসংখ্য কাচের টুকরো দিয়ে রচিত চিত্র ঐ যুগে বিশেষভাবে বিকাশলাভ করেছিল।

বিদ্যোৎসাহ : জাস্টিনিয়ান শিক্ষা-দীক্ষারও উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু পুস্তকে সুসমৃদ্ধ সুবিশাল গ্রন্থশালা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কন্‌স্টান্টিনোপলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। অবশ্য, খ্রীষ্টধর্মবিরোধী ব'লে গণ্য হওয়ায় গ্রীক দার্শনিকদের শিক্ষায়তন তিনি ধ্বংস করেছিলেন।

জাস্টিনিয়ান ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয়। বিলাস-দ্রব্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ঐ যুগে রেশম ও রেশমী বস্ত্র কেবল চীনদেশেই উৎপন্ন হ'ত। রেশম কিভাবে উৎপন্ন হয়, সে সম্পর্কে জাস্টিনিয়ান উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং চীনদেশ থেকে রেশমের গুটিপোকা চুরি ক'রে আনিয়ে নিজের সাম্রাজ্যে রেশম উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। অবিরাম যুদ্ধ এবং সুরম্য প্রাসাদ, গির্জা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে বহু অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি প্রজাদের উপর দুঃসহ কর-ভার চাপাতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর রাজকোষ প্রায়ই শূন্য থাকত। ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

৪. জাস্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা

আইন-সংকলনের উদ্দেশ্য : বীর যোদ্ধা এবং শিল্প ও শিক্ষা-দীক্ষার অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকরূপে জাস্টিনিয়ান যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে তাঁর স্বীকৃতি লাভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর অন্য একটি কীর্তি তাঁকে ইতিহাসে অমর করেছে। সারা সাম্রাজ্যে অরাজকতার ভাব দেখা দিয়েছিল, আইনের

শাসন ব'লে কিছুই ছিল না। বিচারের নামে প্রায়ই অবিচার হ'ত। তাই জাস্টিনিয়ান ন্যায়ের মর্যাদা ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য আইন-সংস্কার ক'রে আইনগুলির সংকলনের ব্যবস্থা করেন।

রোমান আইন অনুসারেই শাসন ও বিচার-ব্যবস্থা পরিচালিত হ'ক, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু ঐসব আইন জনসাধারণ কেন, বিচারকরাও সব সময় ঠিক জানতেন না। কারণ, বিগত কয়েক শতাব্দী ধ'রে বিভিন্ন সময়ে সম্রাটরা যেসব আদেশ জারী করেছিলেন, সেগুলিই রোমান-আইন বলে গণ্য হ'ত। আর ঐসব আদেশ ছিল অসংখ্য এবং অনেক সময় পরস্পরবিরোধী। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল পুনরুক্তি মাত্র। ঐ আইনের সঙ্গে ছিল অসংখ্য বিচারকের রায় এবং অসংখ্য আইনবিদের ব্যাখ্যা। ফলে রোমান আইনগুলি ঠিকমতো জানা ছিল প্রায় অসম্ভব।

আইন-সংকলন ঃ তাই জাস্টিনিয়ান রোম সম্রাটদের ঘোষিত আদেশগুলি পর্যালোচনা ক'রে তা থেকে ব্যবহারযোগ্য একটি আইন-সংকলন রচনার সংকল্প করেন। এজন্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন-সংকলন প্রকাশ করেন। বিচারকদের রায় এবং আইনবিদ্‌দের ব্যাখ্যা ও অভিমতগুলি পর্যালোচনার জন্য অন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটিও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ দুই গ্রন্থের একটি সহজ ও ব্যবহারযোগ্য সংক্ষিপ্তসার রচিত হয়। জাস্টিনিয়ান নিজেও কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেন। ঐ তিনখানি গ্রন্থ এবং জাস্টিনিয়ান-প্রণীত আইনগুলি একত্র মধ্যযুগে কোড নামে প্রচলিত ছিল। এই কোড বা রোমান আইনসমূহের সংগতিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ সংকলনই জাস্টিনিয়ানের আইন-সংহিতা। এই আইন-সংহিতার ভিত্তিতেই পরবর্তিকালে বহু ইউরোপীয় আইন রচিত হয়েছে। আজও আইনশিক্ষার্থীদের ঐসব আইনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হয়।

৫. বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণে বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব

বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে গুরুত্ব : সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন প্রাচীন গ্রীক নগরী বাইজান্‌টিয়ামের অবস্থান-স্থলের অনেক সুযোগ-সুবিধা লক্ষ্য ক'রেই এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সমূদ্র-পথে সাম্রাজ্যের সকল অংশের সঙ্গে বাইজান্‌টিয়ামের যোগাযোগ ছিল। ভূমধ্যসাগর, ঈজিয়ান সাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর, আড্রিয়াতিক সাগর, লোহিত সাগর প্রভৃতির তীরবর্তী সকল নগর ও বন্দরের সঙ্গে এর যোগাযোগ সমুদ্রপথে সহজ হওয়ায় ঐসব স্থানের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। স্থলপথেও এর সঙ্গে যেমন সমস্ত ইউরোপের যোগাযোগ সহজ ছিল, তেমনি চীন, ভারত, পারস্য, মিশর প্রভৃতি সুসভ্য দেশগুলির সঙ্গেও এর যোগাযোগ ছিল সহজ। চীন, ভারত, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশ থেকে যেসব পণ্যসম্ভার বাইজান্‌টিয়ামে এসে পৌঁহত, তা জলপথে ও স্থলপথে বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের ও ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ত। এইভাবে বাইজান্‌টিয়াম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং কয়েক শতাব্দীকাল তা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগর ও বন্দর।

শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণে গুরুত্ব : রোমের পতনের পর পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। ঐসময়ে বাইজান্‌টিয়াম শিক্ষা-সংস্কৃতির রক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিল। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বাইজান্‌টিয়াম যেমন অগ্রণী ছিল, তেমনি সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা ছিল অগ্রণী। বাইজান্‌টিয়ামের সম্রাট ও সম্ভ্রান্তরা সাহিত্য-দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানে বহু গ্রন্থশালা ও শিক্ষালয় গড়ে উঠেছিল। জাস্টিনিয়ান এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যে ল্যাটিন ভাষা ও রোমান সংস্কৃতির চেয়ে গ্রীক

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবই ছিল বেশী। ফলে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ্ এখানেই সংরক্ষিত হয়েছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাইজান্টিয়াম খুবই অগ্রসর ছিল। শোনা যায়, এখানে নাকি বিজ্ঞানীরা একপ্রকার তরল রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন, যা নিক্ষেপ ক'রে বাইজান্টাইন বাহিনী আক্রমণকারী আরব নৌবহরকে ভস্মীভূত ক'রে দিয়েছিল।

অনুশীলনী

১। বাইজান্টিয়াম কোথায় অবস্থিত? কে এখানে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন? বাইজান্টিয়ামের নতুন নাম কি হয়েছিল? এখন ঐ শহরের নাম কি?

২। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলতে কি বোঝায়? এই সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? তিনি রোম সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ও সংহতি ফিরিয়ে আনতে কি করেছিলেন? কতখানি সফল হয়েছিলেন?

৩। সম্রাট জাস্টিনিয়ান কে ছিলেন? তিনি রোম সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ও সংহতি উদ্ধারে কতখানি সফল হয়েছিলেন?

৪। সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের সাহিত্য, চিত্রকলা ও শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে কি জান?

৫। জাষ্টিনিয়ানের কোড বা আইন-সংহিতা কি? বর্তমান সমাজ-সভ্যতার বিকাশে তার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৬। বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে এবং সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সংরক্ষকরূপে বাইজান্টিয়ামের গুরুত্ব কিরূপ ছিল?

৭। টীকা লিখ: কন্স্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা; সম্রাজ্ঞী থিওডোরা; বেলিসেরিয়াস; প্রথম খসরব।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) — সাগরের মুখে — প্রণালীর কাছে প্রাচীন — নগরী বাইজান্টিয়াম অবস্থিত। সম্রাট — এখানে রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের নাম হয় —। এই নগরের বর্তমান নাম —।

(খ) সম্রাট জাষ্টিনিয়ান ছিলেন সম্রাট — এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি —খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। তাঁর দুই প্রধান সহায়ক ছিলেন

তাঁর স্ত্রী সম্রাজ্ঞী — এবং সেনাপতি —। জাস্টিনিয়ান যে রোমান আইন-সমূহের সংকলন রচনা করেন, তা — নামে পরিচিত।

৯। নির্ভুল অংশের নিচে দাগ দাওঃ

(ক) কন্‌স্টান্টিনোপল লোহিত সাগরের মুখে/কৃষ্ণ সাগরের মুখে/কাস্পিয়ান সাগরের মুখে অবস্থিত।

(খ) রোমান আইনের সংকলন করেন কন্‌স্টান্‌টাইন/থিওডোসিয়াস/জাস্টিনিয়ান।

(গ) সান্টা সোফিয়া গির্জা রোমে/বাইজান্‌টিয়ামে/প্যারিসে অবস্থিত।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্নঃ

১। কে কন্‌স্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

২। কোন্ প্রাচীন শহরের উপর কন্‌স্টান্টিনোপল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

৩। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান চার্চের প্রধান ছিলেন কে ?

৪। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের চার্চকে কি বলা হয় ?

৫। জাস্টিনিয়ান রোমান আইনের যে সংকলন প্রণয়ন করেন, তাকে কি বলা হয় ?

৬। সান্টা সোফিয়া গির্জা কোথায় অবস্থিত ? কে ঐ গির্জা নির্মাণ করেছিলেন ?

৭। মোজেইক-শিল্প কি ?

৮। কন্‌স্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম কি ?

———

ইসলামের অভ্যুত্থান ৫

১. আরবদেশ ও আরব জাতি

আরবদেশঃ দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর। আরব সাগরের পশ্চিমে আরব দেশ। দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগর মিশর থেকে এবং উত্তর-পূর্বে পারস্যোপসাগর পারস্য থেকে আরবদেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে। লোহিত সাগরের দিকে আরবদেশের দক্ষিণ-

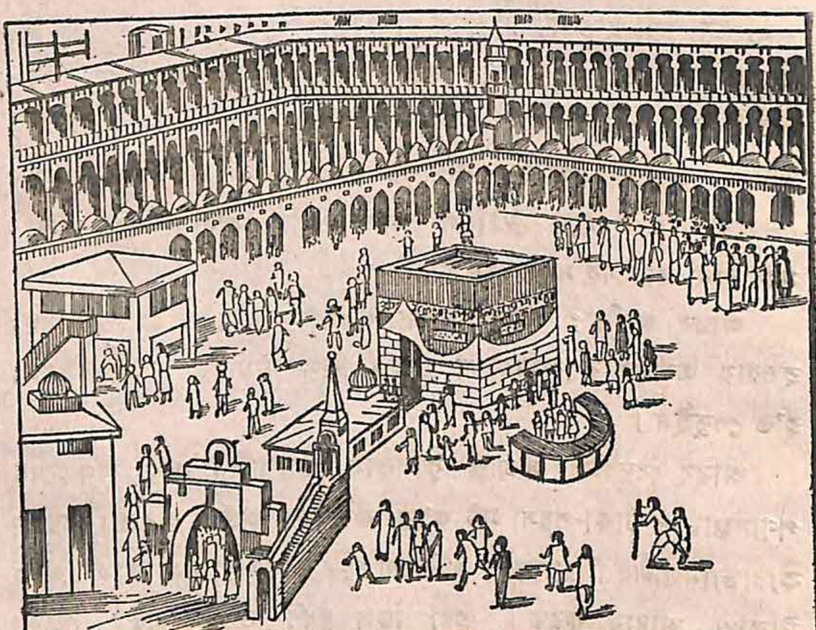
পশ্চিম অংশে রয়েছে সবুজ উর্বরভূমি। কিন্তু এই দেশের উত্তর ও মধ্য ভাগ মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্যে আছে মরূদ্যান। আরবদেশের মধ্য দিয়ে কতকগুলি দীর্ঘ পথ ছিল। ঐ পথগুলি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য চলত। সারি সারি পণ্যবাহী উটের দল যেত মরুভূমির মধ্যে দিয়ে। এগুলিকে বলা হ'ত ক্যারাভ্যান বা কাফেলা। বণিকরা দলবদ্ধভাবে তাদের ক্যারাভ্যানগুলি নিয়ে যেত। সঙ্গে থাকত লোকজন, সশস্ত্র রক্ষীর দল। এরা যেসব স্থানে বিশ্রাম করত, সেসব স্থানে শহর গড়ে উঠত। এইভাবে লোহিত সাগরের তীর থেকে অল্প দূরে দেশের ভেতরের দিকে গড়ে উঠেছিল আরবদেশের প্রধান শহর মক্কা। মক্কা নানা কারণেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

আরব জাতি ঃ আরবদেশের অধিকাংশ স্থান মরুময় ও পার্বত্য হওয়ায় এখানকার অধিকাংশ লোক ছিল যাযাবর। এদের বলা হ'ত বেদুইন।

আরব বেদুইনরা সামান্য কৃষিকার্য, পশুপালন এবং বণিকদের পণ্যসম্ভার ও টাকা-পয়সা লুট ক'রে জীবিকা অর্জন করত। তারা ক্যরাভ্যানগুলির নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকাও আদায় করত। এরা ছিল দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয়। ঘোড়া আর উট ছিল এদের প্রধান সহায়। এরা অনেক উপজাতিতে বিভক্ত ছিল এবং এই উপজাতিগুলি ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে কলহ ও হানাহানি করত।

প্রত্যেক উপজাতির ছিল নিজস্ব দেবদেবী। তারা পাথরের নুড়ি প্রভৃতিকে নিজ নিজ উপজাতির দেবদেবী কল্পনা ক'রে পুজো করত। মক্কা শহরে কালো পাথরের চারকোণা একটি মন্দির আছে। এর নাম কাবা। এই কাবাতেই বিভিন্ন উপজাতির দেবদবীর প্রতীক প্রায় ৩০০ পাথরের নুড়ি ছিল। তাছাড়া, কাবার এক কোণে ছিল একটি উল্কাজাত পাথর। তাকে সকলেই প্রধান দেবতা বলে মানত। ফলে সকল উপজাতির লোকই মক্কায় আসত। মক্কায় কেউ

হানাহানি মারামারি করত না। মক্কার মতো নিরাপদ স্থান সারা আরবদেশে আর ছিল না। তাই আরব উপজাতিগুলি নির্ভয়ে এসে এখানে মিলিত হ'ত।



কাবা মসজিদ—মক্কা

আরবদের ঐক্যবন্ধনের আর একটি সূত্র ছিল তাদের ভাষা। সকলেই আরবী ভাষায় কথা বলত। মক্কায় এসে সকল আরব উপজাতির কবিরা স্বরচিত কবিতা ও গান আবৃত্তি করতেন ও গাইতেন। যেসব কবিতা বা গান শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হ'ত, সেগুলি সারা আরবদেশে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত।

কাব্য ও আরবী ভাষা যেমন তাদের মিলনের দুই প্রধান সূত্র ছিল, তেমনি তাদের মিলনের প্রধান বাধা ছিল তাদের নিজস্ব কয়েক শত দেবদেবী। এই বাধা দূর ক'রে যিনি আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তিনি হজরত মহম্মদ।

২. হজরত মহম্মদ ও তাঁর বাণী

প্রথম জীবন ঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শহরে এক দরিদ্র পরিবারে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম আবদুল্লা ও মার নাম আমিনা। মহম্মদ খুবই সুশ্রী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর ভাবাবেশ হ'ত। প্রথম জীবনে তিনি রাখালের কাজ করতেন। পরে খাদিজা নামে এক ধনী সম্ভ্রান্ত বিধবার কাছে চাকরি নিয়ে তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করতে থাকেন। তাঁর সততায় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে খাদিজা তাঁকে বিবাহ করেন। খাদিজাকে বিবাহ করায় মক্কায় মহম্মদের সম্মান-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়।

ব্যবসা ও কর্ম উপলক্ষে মহম্মদকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হ'ত। ঐসময়ে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা এক ও নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাঁদের সঙ্গে মেলা-মেশার ফলে মহম্মদের মনেও এক ও নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা দৃঢ় হতে থাকে। নির্জন মরু-প্রান্তরে ও গিরিগুহায় তাঁর বহু চিন্তামগ্ন মুহূর্ত কাটে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেয়েছেন—ঈশ্বর এক ও নিরাকার এবং তিনি নিজে ঈশ্বরের পয়গম্বর বা বাণীবাহক।

ধর্মপ্রচার ঃ কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে বলা ছিল বিপজ্জনক। এ ছিল প্রচলিত ধর্মের বিরোধিতা। মহম্মদ তাঁর এই নতুন ধর্মবিশ্বাসেরকথা প্রথমে তাঁর স্ত্রী খাদিজা, বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর, পোষ্যপুত্র আলি ও ভৃত্য জাইদকে জানান। তাঁদের মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ক্রমেই মহম্মদের অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এখন মহম্মদ প্রকাশ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এই ধর্মমতের নাম দেন **ইসলাম**। ইসলামে বিশ্বাসীদের নাম হয় মুসলিম বা মুসলমান।

মহম্মদ বললেন, আল্লাহ্ (ঈশ্বর) এক ও নিরাকার। তাঁর মূর্তি কল্পনা ক'রে কিছুর উপাসনা মহাপাপ। প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। অনাড়ম্বর জীবনযাপন, সুরাপান ত্যাগ,

স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না, তারা দোজখে (নরকে) যায়, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; যারা ইসলামে বিশ্বাস করে, তারা বেহেস্তে (স্বর্গে) গিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করে।

মহম্মদ ভাবের ঘোরে যখন তাঁর বাণীগুলি বলতেন, তখন তাঁর শিষ্যরা হাতের কাছে যা পেতেন, তাতেই তা টুকে রাখতেন। পরে এইসব বাণী সংকলিত হয়। এই সংকলনই কোর্‌আন নামে পরিচিত। কোর্‌আন মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ।

মক্কায় দেবদেবী উপাসনার জন্য সারা আরবের লোক আসত। তার উপরেই নির্ভর করত মক্কার সমৃদ্ধি। মহম্মদের ধর্ম মেনে নিলে মক্কার সমৃদ্ধি বিনষ্ট হবে মনে ক'রে মক্কা শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁর বিরোধিতা করতে লাগলেন। মক্কায় রক্তপাত নিষিদ্ধ হ'লেও তাঁরা মহম্মদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন। ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে মহম্মদ গোপনে মক্কা ছেড়ে ইয়াথ্‌রেবে পালিয়ে গেলেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর মহম্মদ মক্কা ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাই ঐ তারিখ থেকে হিজরা সন গণনা করা হয়। হিজরত শব্দের অর্থ পলায়ন।

ইয়াথ্‌রেবে পূর্ব থেকেই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের প্রভাব ছিল। বহু দেবদেবীর পুজার সঙ্গে মক্কার সমৃদ্ধি জড়িত থাকলেও ইয়াথ্‌রেবের সেরূপ কোন স্বার্থ ছিল না। তাই ইয়াথ্‌রেবে মহম্মদের ধর্মমত দ্রুত গৃহীত হ'ল। ইয়াথ্‌রেবের নতুন নাম হ'ল মদিনা। মদিনা শব্দের অর্থ 'নব-ধর্মগুরুর নগর'।

মক্কাবাসীরা নীরব রইল না। তারা মদিনার ওপর আক্রমণ চালালো। ফলে মদিনাবাসী ও মক্কাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চললো। অবশেষে ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে, মদিনা গমনের সাত বছর পরে, মহম্মদ বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন। মক্কাবাসীরা মহম্মদের ধর্মমত মেনে নিল। তবে মক্কার স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য মহম্মদ মক্কা ও কাবার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার ক'রে নিলেন। মক্কার দিকে মুখ

ক'রে উপসনা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য হ'ল। মক্কা মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ব'লে স্বীকৃতি পেল।

মক্কা প্রবেশের তিন বছর পরে, ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হজরত (মহামান্য) মহম্মদের মৃত্যু হয়।

৩. ইসলামের দ্রুত বিস্তারলাভের কারণ

ধর্মমতে অভিনবত্বের অভাব: রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের স্বীকৃতি লাভ করতে প্রায় তিন শ বছর লেগেছিল। কিন্তু এক শতাব্দীকালের মধ্যেই ইসলাম ধর্ম এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সুবিশাল ভূখণ্ডে এবং ইউরোপের কিছু অংশে বিস্তার লাভ করেছিল। এর কতকগুলি কারণ ছিল।

ইহুদীরা ও খ্রীষ্টানরা বহুকাল ধরেই এক ও নিরাকার ঈশ্বরের উপসনার কথা প্রচার করেছিলেন। তাই মহম্মদের ধর্মমত এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের জনসাধারণের কাছে নতুন কিছুই ছিল না। মহম্মদ আব্রাহাম, মুশা, খ্রীষ্ট প্রভৃতিকে তাঁর পূর্ববর্তী ঈশ্বরের বাণী-বাহক বা পয়গম্বর বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। ফলে ইসলামকে গোড়ার দিকে ইহুদীদের ও খ্রীষ্টানদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয় নি।

প্রচলিত ধর্মমতগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব: অন্যপক্ষে, ঐ সময়ে খ্রীষ্টধর্মে আরিয়ান, আথানেসিয়ান, নেস্টোরিয়ান প্রভৃতি নানা মত ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। খ্রীষ্টানদের মধ্যে কূটতর্ক নিয়ে যে মতবিরোধ ও শত্রুতা, এবং অনেক ক্ষেত্রে, রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব চলছিল, তা মানুষকে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিরূপ ক'রে তুলেছিল। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে নানা দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্টের বাণী থেকে খ্রীষ্টধর্ম অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষ সহজেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

রাজশক্তির সহায়তা: ধর্মের প্রচারকরা সাধারণত মানুষের হৃদয় জয়ের দ্বারা তাঁদের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এ

পথে ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচার তেমন দ্রুত হয় না। যিশু খ্রীষ্ট স্বয়ং মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর পরে সেন্ট পিটার, সেন্ট পল প্রভৃতি তাঁর অসংখ্য ভক্ত দুঃসহ অত্যাচার-লাঞ্ছনা বরণ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার ঘটে নি। যিশুর মৃত্যুর প্রায় তিনশ বছর পরে রোম সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় ও খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ায় তা দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সুদীর্ঘকাল পরে অশোক ও কণিষ্কের মতো শক্তিশালী সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বৌদ্ধধর্ম দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল। ইসলামের উজ্জবনী শক্তি আরবদের শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ করেছিল। তারা দ্রুত সুবিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। আর ধর্মনায়ক খলিফারাই ছিলেন সুলতান বা রাষ্ট্রনায়ক।

ইসলামের বিস্তারকে সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে কখনো পৃথকভাবে দেখা হয় নি। তাই ইসলামের বিস্তারে রাজ-শক্তি ও সৈন্যবাহিনী সর্বদাই সহায়ক ছিল।

৪. খলিফাগণ ও আরব সাম্রাজ্যের বিস্তার

প্রথম খলিফাগণ ঃ হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রধান শিষ্য ও অন্যতম শ্বশুর আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। আবু বকর প্রথমেই সমগ্র আরবদেশে ইসলাম প্রচার ক'রে একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সিরিয়ার কিছু অংশও অধিকার করেন। কিন্তু মাত্র দু বছর খলিফাপদে থাকার পর ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

তখন খলিফা নির্বাচিত হন হজরত মহম্মদের অন্যতম শ্বশুর ওমর। ওমর ৬৩৪ থেকে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খলিফা ছিলেন। তাঁর সময়ে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য, মিশর ও ফিনিসিয়ায় আরব সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।

৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ওমরের মৃত্যু হ'লে খলিফা নির্বাচিত হন ওসমান। ওসমান ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খলিফা ছিলেন। এঁরা সকলেই নির্বাচনের মাধ্যমে খলিফা হয়েছিলেন এবং খলিফাদের রাজপাট ছিল মদিনা। খলিফারা ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা ও সম্রাট।

আলি ও খলিফার পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব : কিন্তু হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে খলিফা-পদ লাভের যে দাবি উঠেছিল, তা ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে এবং ওসমানের মৃত্যুর পর খলিফা হন হজরত মহম্মদের পোষ্যপুত্র ও জামাতা আলি।

আলি খলিফা হ'লে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া তাঁকে খলিফা ব'লে স্বীকার করতে অসম্মত হন। ফলে বিবাদ বাধে। মুয়াবিয়ার চক্রান্তে আলি নিহত হন। আলির মৃত্যুর পর খলিফা হন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হাসান। কিন্তু মুয়াবিয়ার বিরোধিতার ফলে তিনি খলিফা-পদ ত্যাগ করেন এবং চুক্তি হয় যে, মুয়াবিয়া খলিফা হবেন এবং মুয়াবিয়ার মৃত্যু হ'লে খলিফা হবেন হাসানের ভাই হুসেন। মুয়াবিয়া হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। পরে তিনি চুক্তি ভঙ্গ ক'রে হুসেনের পরিবর্তে নিজ পুত্র এজিদকে খলিফা মনোনীত করেন।

এজিদ খলিফা হওয়ার পর ইরাকের অন্তর্গত কুফার অধিবাসীরা এজিদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য হুসেনের কাছে আবেদন করে। হুসেন তাঁর পরিবার ও বিশ্বস্ত অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে কুফা যাত্রা করেন। কুফার পঁচিশ মাইল উত্তরে কারবালা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন, কুফাবাসীর আবেদন এজিদের চক্রান্ত মাত্র, তিনি কুফা যাত্রা ক'রে এজিদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। এজিদের সৈন্যদল তাঁকে ঘিরে ফেলে, তাঁদের জল-সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দিয়ে তৃষ্ণায় শুকিয়ে মারবার চেষ্টা করে। এর পর তারা নৃশংসভাবে তাঁর পরিবারের সকলকে ও অনুচরদের হত্যা করে। শত্রুর অস্ত্রাঘাতে হুসেনেরও মৃত্যু হয়। এই ঘটনার স্মরণেই মহর্‌রম অনুষ্ঠিত হয়। কারণ, আরবী মহর্‌রম মাসে এই ঘটনা ঘটেছিল।

উমাইয়াদ খলিফাগণ ঃ মুয়াবিয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন উমাইয়া। তাই মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত খলিফা-বংশ উমাইয়াদ বংশ নামে পরিচিত। উমাইয়াদবংশীয় খলিফাদের রাজধানী ছিল সিরিয়ার দামাস্কাস শহরে। উমাইয়াদ-বংশীয় খলিফারা ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের শাসনকালে আরব অধিকার আরো বিস্তার লাভ করেছিল। আরবরা সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় অধিকার বিস্তার ক'রে জিব্রল্টার প্রণালী পার হয়ে স্পেনে প্রবেশ করেছিল। জিব্রল্টার নামটি দুর্ধর্ষ আরব সেনাপতি তারিকের নাম অনুসারেই হয়েছে। ঐস্থানে যে পাহাড় আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল জব্‌র্ অল্ তারিফ। ঐ জব্‌র্-অল্-তারিফ থেকেই জিব্রল্টার শব্দের উৎপত্তি আরবরা সমগ্র স্পেন অধিকার ক'রে ফ্রান্সেও প্রবেশ করে

আব্বাসীয় খলিফাগণ ঃ হজরত মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের এক বংশধর উমাইয়াদ-বংশীয় খলিফাদের বিতাড়িত ক'রে খলিফা হন। এই খলিফা-বংশ আব্বাসীয় বংশ নামে পরিচিত। আব্বাসীয় বংশীয়দের রাজধানী ছিল বাগদাদ। 'আরব্য রজনী' গল্পের বিখ্যাত খলিফা হারুন-অল্ রশিদ (৭৬৬—৮০৯) এই আব্বাসীয় বংশের খলিফা ছিলেন।

উমাইয়াদ-বংশীয় খলিফার এক বংশধর স্পেনে পালিয়ে যান। তিনি সেখানে কর্ডোভা নগরে নিজেকে খলিফা ব'লে ঘোষণা করেন। কর্ডোভা আরব সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

আব্বাসীয় খলিফারা ভারতের সিন্ধু অঞ্চল, বালুচিস্তান, তুর্কিস্থান, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার এক সুবিশাল অঞ্চলে রাজত্ব করেন।

ইসলামের সাফল্যে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া ঃ আরব বাহিনী দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়েছিল। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিশাল অংশ তারা জয় করেছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের এশীয় অংশের অনেকখানি তারা জয় করলেও বাইজান্টাইন

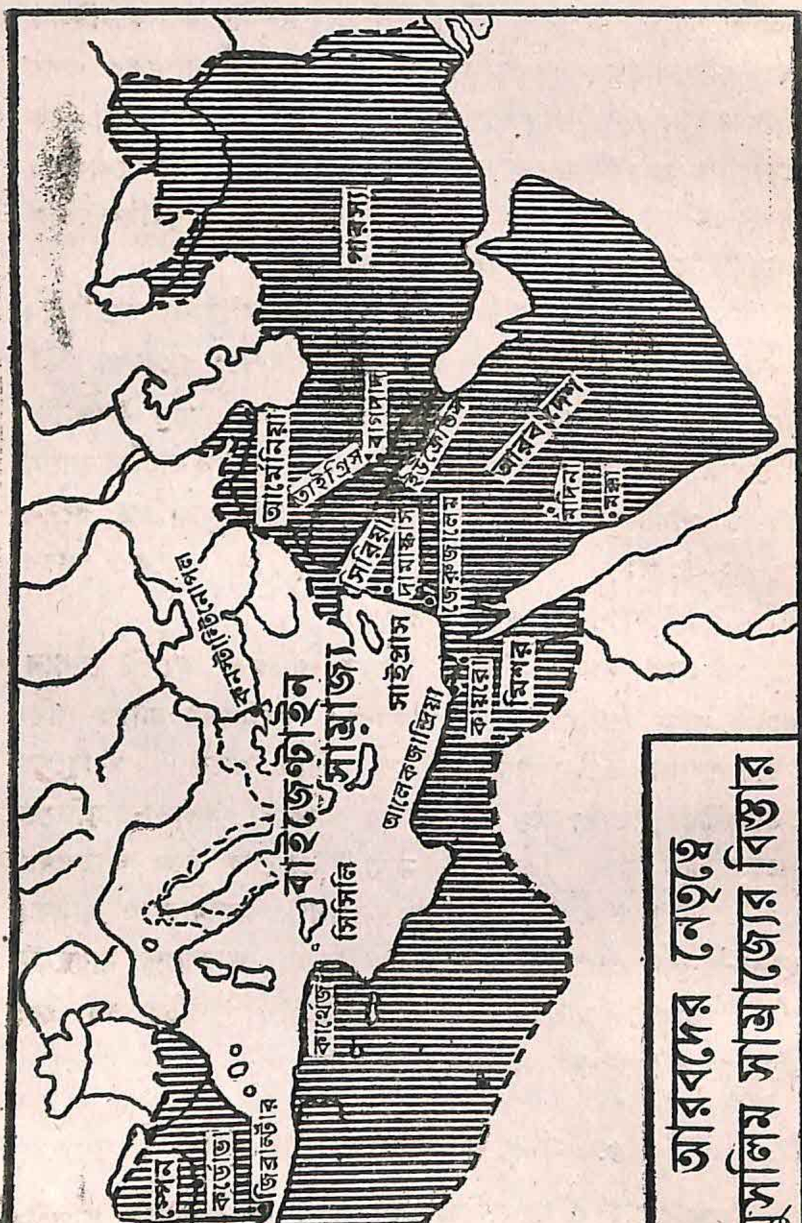
সাম্রাজ্য পূর্বদিক থেকে তার ইউরোপে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করেছিল। তারা এই পথ উন্মুক্ত করবার জন্য বার বার কন্‌স্টান্টিনোপলের ওপর আক্রমণ চালায়। শেষে ৭১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তরল আগুন' নামে এক রাসায়নিক দ্রব্য নিক্ষেপ ক'রে বাইজাণ্টাইন বাহিনী আরব নৌবহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আরবরা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পূর্বদিক থেকে তাদের ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

তারা উত্তর আফ্রিকার পথে স্পেনে অধিকার বিস্তার করেছিল। স্পেন থেকে তারা ফ্রান্সের পথে ইউরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। ঐ সময় ফ্রান্স ও জার্মানিতে ফ্রাঙ্ক্ নামে জার্মান উপজাতি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিল। ফ্রাঙ্ক্-নেতা চার্লস্ মার্টেল ফ্রান্সে তুর ও পোয়াতিয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আরবদের পরাজিত করেন (৭৩২ খ্রীঃ অঃ)। এইভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকেও আরব বাহিনীর ইউরোপে প্রবেশ প্রতিহত হয়।

ইউরোপে আরব অধিকার বিস্তার প্রতিহত হ'লেও স্পেনে আরব শক্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। পূর্বদিকের আরব শক্তি ইউরোপীয়দের প্রতিবেশীরূপে বিরাজ করতে থাকে। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনায় আরবরা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত ছিল। কিছুকালের মধ্যে ইউরোপের সঙ্গে আরবদের সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্রাট শার্লেমান ও খলিফা হারুন-অল্-রশিদের মধ্যে দূত-বিনিময় চলে। আরবদের মাধ্যমেই গ্রীক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ইউরোপ পরিচিত হয় এবং ইউরোপের বৈদেশিক বাণিজ্যও গ'ড়ে ওঠে।

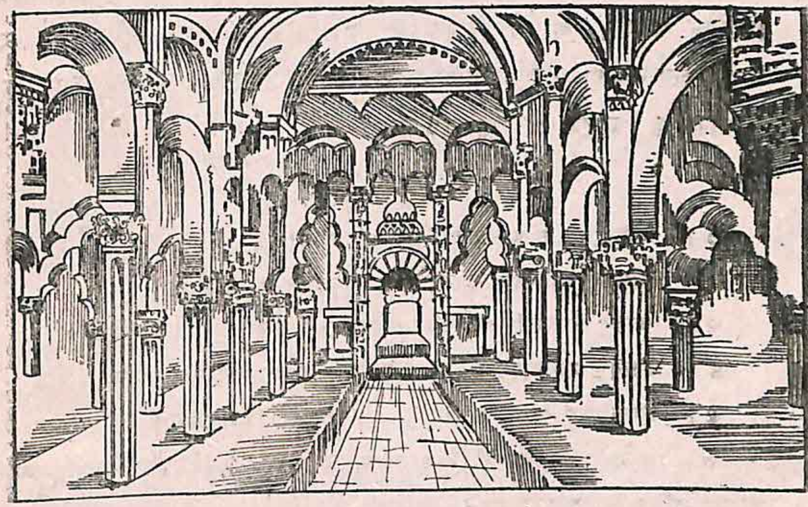
৫. মানব সভ্যতায় আরবের দান

বিদ্যোৎসাহ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ঃ আরব জাতি পৃথিবীর এক সুবিশাল ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রেই ক্ষান্ত ছিল না। তারা ঐসব স্থানের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ্ আহরণ ক'রে নিজেদের সুসভ্য করে তুলেছিল। তারাই প্রাচীন গ্রীক,



আরবদের নেতৃত্বে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার

মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ফিনিসীয়, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুলেছিল। দামাস্কাস, বাগদাদ, কাইরো, আলেকজান্দ্রিয়া, কর্ডোভা প্রভৃতি স্থান মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টান গির্জা ও মঠের মতোই মসজিদগুলিও শিক্ষা-বিস্তারে ব্রতী হয়েছিল। খলিফারা বিশাল গ্রন্থশালা, বিদ্যার্চচা-কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা তাঁদের দরবারে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটাতেন এবং প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনুবাদ করাতেন। স্পেনের কর্ডোভায়ও ঐরূপ বিদ্যার্চর্চা-কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছিল। সেখানে বহু খ্রীষ্টান ও ইউরোপীয় ছাত্র দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আসত।



কর্ডোভার মসজিদ—আরবদের কীর্তি

ইব্‌ন্ রশিদ ছিলেন আরব দুনিয়ার অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ইউরোপে আভেরোস নামে পরিচিত। আরব দুনিয়ার আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ইব্‌ন্ সিনা। তিনি ইউরোপে আভিসেনা নামে পরিচিত। তিনি ঐ যুগে চিকিৎসাবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। আরবরাই আধুনিক বীজগণিতের উন্নতিসাধন করেছিলেন। ইংরেজি

'অ্যাল্‌জেব্‌রা' শব্দটি আরবী 'অল্‌-জেবর' শব্দ থেকে এসেছে। সম্ভবত আরবরা বীজগণিত এবং শূন্য সংখ্যা ও দশমিকের ব্যবহার ভারত থেকেই নিয়েছিলেন। আরবরা রসায়ন, ভেষজ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প প্রভৃতিতেও উন্নতি করেছিলেন। আল্‌-কিমি (কেমিষ্ট্রি), আল্‌কোহল প্রভৃতি শব্দগুলি আরবী থেকেই এসেছে। চীনারা কাগজ আবিষ্কার করলেও আরবরাই তা ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চালু করেছিল।

শিল্পকলায় অবদান : স্থাপত্য ও চিত্রকলাতেও আরবরা খুবই উন্নতি করেছিল। আরবী স্থাপত্য পরবর্তী যুগের স্থাপত্যশিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। মূর্তিনির্মাণ ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ায় ভাস্কর্যশিল্পে আরবদের দান বিশেষ ছিল না। মূর্তি অঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় আরব চিত্রকররা জ্যামিতিক রেখার বিন্যাসে যে বর্ণবিচিত্র নকশা ও লতাপাতা-ফুল প্রভৃতি আঁকতেন, তা 'অ্যারাবেস্ক্‌' (আরবীয়) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

অনুশীলনী

১। আরবদেশ ও আরব জাতির পরিচয় দাও।

২। বেদুইন আরবরা কিভাবে জীবন-যাপন করত ?

৩। আরব উপজাতিগুলির মধ্যে মিলনের সূত্র ও বাধা কি ছিল ?

৪। হজরত মহম্মদের জীবন ও বাণী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। ইসলামের প্রচার ও বিস্তার এত দ্রুত হয়েছিল কেন ?

৬। খলিফা শব্দের অর্থ কি ? কোন্‌ কোন্‌ খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন ? তাঁদের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৭। গোড়ার দিকে খলিফাপদ নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণ কি ? এই দ্বন্দ্বের পরিণতি কি হয়েছিল ?

৮। মুয়াইয়াদবংশীয় খলিফা কাদের বলা হয় ? তাঁদের রাজধানী কোথায় ছিল ? তাঁদের সময়ে মুসলিম অধিকার কিরূপ বিস্তার লাভ করেছিল ?

৯। আব্বাসীয় খলিফা কাদের বলা হয় ? তাঁদের রাজধানী কোথায় ছিল ? এঁদের মধ্যে একজন বিখ্যাত খলিফার নাম কর।

১০। কর্ডোভা কোথায় ? সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তারে কর্ডোভার দান কি ?

১১। মানব সভ্যতায় আরবদের দান সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২। ইউরোপে আরব শক্তির অগ্রগতি কিভাবে প্রতিহত হয়েছিল? আরব শক্তির অভ্যুত্থানের প্রভাব ইউরোপে কতখানি পড়েছিল?

১৩। টীকা লিখ: কাবা; আবু বক্‌র; ওমর; তারিফ; মহর্‌রম; হারুন-অল্‌-রশিদ; চার্ল্‌স্ মার্টেল; কর্ডোভা; ইব্‌ন্ রশিদ; ইব্‌ন্ সিনা; জিব্রল্টার; অ্যারাবেস্ক; হিজরা সন; মদিনা।

১৪। নির্ভুল উক্তির নিচে দাগ দাও:

(ক) প্রথম খলিফা হয়েছিলেন ওমর/আবু বক্‌র/ওসমান।

(খ) প্রথম খলিফাদের রাজধানী ছিল দামাস্কাস/বাগদাদ/মদিনা।

(গ) কাবা মদিনায়/মক্কায়/বাগদাদে অবস্থিত।

(ঘ) আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিলেন আলি/মুয়াবিয়া/হারুন-অল্‌-রশিদ।

(ঙ) কর্ডোভা ইতালিতে/ফ্রান্সে/স্পেনে অবস্থিত।

(চ) হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ৬৭০/৫৭০/৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) হজরত মহম্মদ — খ্রীষ্টাব্দে — শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম — এবং মাতার নাম —। তিনি — নামে এক ধনী বিধবাকে বিবাহ করেন। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন, তার নাম —। তাঁর বাণীগুলি যে গ্রন্থে সংকলিত আছে, তার নাম —।

(খ) খলিফা শব্দের অর্থ —। হজরত মহম্মদের পর — খলিফা হন। খলিফা — এর মৃত্যুর পর হজরত মহম্মদের জামাতা — খলিফা হন। তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তা — খলিফা বলে স্বীকার করতে অসম্মত হন।

(গ) মুয়াবিয়া যে খলিফা-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তা — বংশ নামে পরিচিত। তাঁদের রাজধানী ছিল —। এঁদের বিতাড়িত ক'রে যাঁরা খলিফা হন, তাঁরা — খলিফা নামে পরিচিত। এঁদের রাজধানী ছিল —। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন —।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। হজরত মহম্মদ কোথায় ও কবে জন্মগ্রহণ করেন?

২। হজরত মহম্মদ যে ধর্ম প্রচার করেন, তার নাম কি?

৩। হজরত মহম্মদের বাণীগুলি যে গ্রন্থে সংকলিত হয়, তার নাম কি?

৪। কাবা কোথায় অবস্থিত? এটি কি?

৫। খলিফা শব্দের অর্থ কি? প্রথম তিনজন খলিফার নাম কর।

৬। উমাইয়াদ খলিফা-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

৭। উমাইয়াদ-বংশীয় খলিফাদের রাজধানী কোথায় ছিল?

৮। আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী কোথায় ছিল? এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত খলিফার নাম কি?

৯। কর্ডোভা কোথায় অবস্থিত? কর্ডোভা কাদের রাজধানী ছিল?

১০। ইব্‌ন্ রশিদ ইউরোপে কি নামে পরিচিত ছিলেন?

১১। ইব্‌ন্ সিনা ইউরোপে কি নামে পরিচিত ছিলেন?

১২। অ্যারাবেস্ক্ কি?

১৩। অ্যাল্‌জেব্রা কোন্ আরবী শব্দ থেকে এসেছে?

মধ্যযুগে (আঃ ৮০০—১২০০ খ্রীঃ অঃ) ইউরোপ ৬

১. ফ্রাঙ্ক্ উপজাতির অভ্যুত্থান

রাজা ক্লভিস ও রাজা পেপিন: পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অধিকার বিস্তার করেছিল। হূন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যেসব জার্মান উপজাতি রোমান সেনাপতি ইটিয়াসকে সাহায্য করেছিল, তাদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক্‌রাও ছিল। ফ্রাঙ্ক্‌দের দলপতি ক্লভিস রোমের পতনের দশ বৎসর পরে, ৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, বর্তমান জার্মানি ও ফ্রান্সে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর বংশধররা অযোগ্য হওয়ায় তাঁরা তাঁদের প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধানমন্ত্রীদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। চার্ল্‌স্ মার্টেল,

যিনি তুরের যুদ্ধে আরবদের পরাজিত ক'রে ইউরোপে তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করেছিলেন, তিনি ক্লভিসের বংশধরদের প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র পেপিন ক্লভিসের শেষ বংশধরকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে নিজে রাজা হন।

২. সম্রাট শার্লেমান

শার্লেমানের সিংহাসন লাভঃ ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পেপিনের মৃত্যু হ'লে তাঁর রাজ্যে ফ্রাঙ্কদের নিয়ম অনুসারে তাঁর দুই পুত্র—কার্লোমান ও চার্ল্‌স্‌-এর মধ্যে বিভক্ত হয়। কিন্তু ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কার্লোমানের মৃত্যু হ'লে চার্ল্‌স্‌ই সমগ্র ফ্রাঙ্ক রাজ্যের অধীশ্বর হন। ইতিহাসে ইনিই **শার্লেমান** বা **মহান চার্ল্‌স্‌** নামে পরিচিত।

রাজ্যবিস্তারঃ শার্লেমান ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের অধিকাংশ সময়েই তাঁকে হয় রাজ্যজয়, নয় বিদ্রোহ-দমনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তিনি কমপক্ষে চুয়ান্নটি যুদ্ধ করেছিলেন এবং একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। জার্মানির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ব্যাভেরিয়ানদের রাজ্য তিনি অনায়াসে অধিকার করেন। জার্মানির উত্তরে স্যাক্‌সন নামে এক দুর্ধর্ষ জার্মান উপজাতি বাস করত। স্যাক্‌সনরা খ্রীষ্টান ছিল না। দুর্ধর্ষ স্যাক্‌সনদের বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্য শার্লেমানকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের পরাজিত ক'রে কঠোরহস্তে দমন করেন। স্যাক্‌সনরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়।

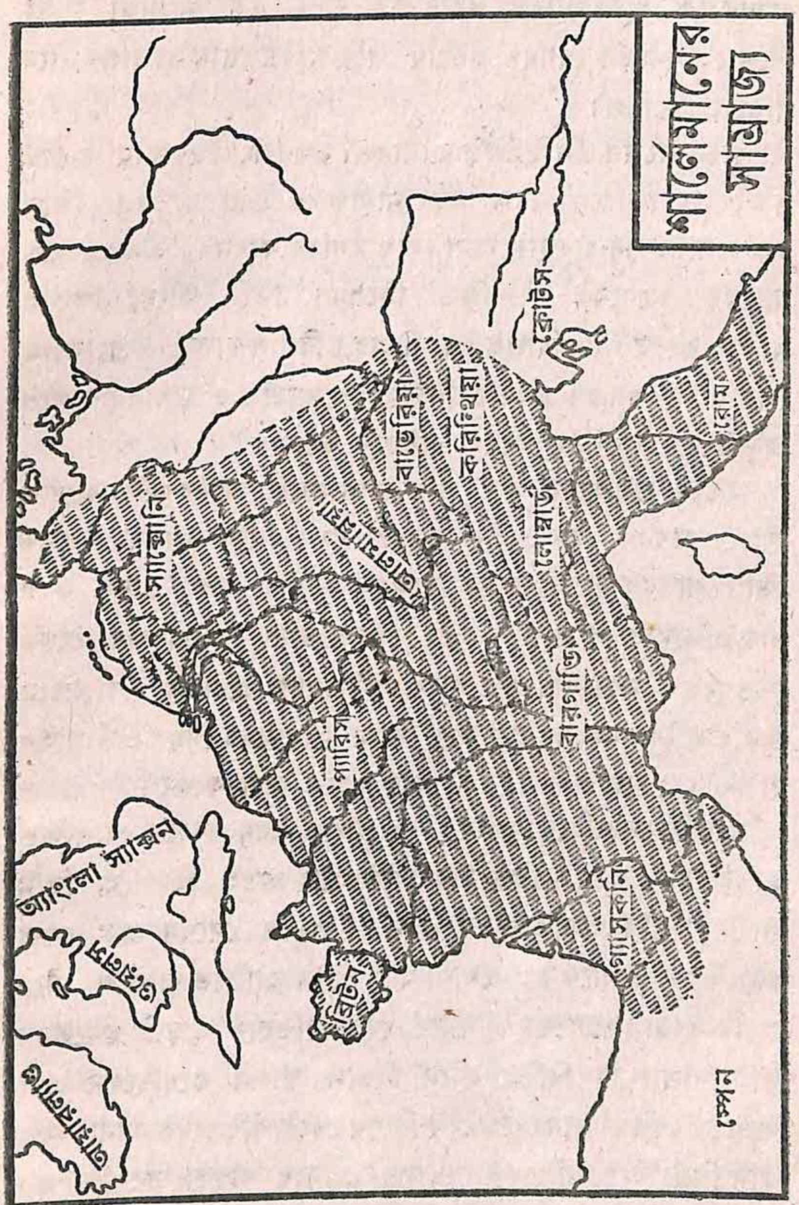

সম্রাট শার্লেমান

শার্লেমান স্পেনের আরবদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রোলাণ্ড যে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন, তা মধ্যযুগের কাহিনী-কিংবদন্তীতে অমর হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত শার্লেমান আরবদের পরাজিত করেন এবং স্পেনের কিছু অংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। এইভাবে শার্লেমান এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন।

রোম সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন: বাইজান্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান অস্ট্রো-গথদের হাত থেকে ইতালি উদ্ধার করেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর লোম্বার্ড নামে এক জার্মান উপজাতি উত্তর ইতালি অধিকার করেছিল। রোমান চার্চের সঙ্গে লোম্বার্ডদের বিবাদ চলায় খ্রীষ্টান জগৎ থেকে রোম প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। লোম্বার্ডরা মধ্য-ইতালি অধিকারের চেষ্টা করলে পোপের আবেদন-ক্রমে শার্লেমানের পিতা পেপিন ইতালি অভিযান ক'রে লোম্বার্ডদের পরাজিত করেছিলেন। তিনি লোম্বার্ডদের কাছ থেকে ইতালির পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ভূভাগ অধিকার ক'রে পোপকে দিয়েছিলেন। এইভাবে রোমান চার্চ এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিকারী হয়েছিল।

শার্লেমানের সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরেই লোম্বার্ডরা পোপ-শাসিত অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। পোপ শার্লেমানের সাহায্য চাইলে শার্লেমান ইতালি অভিযান করেন এবং লোম্বার্ড-অধিকৃত ইতালি স্বরাজ্যভুক্ত করেন।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লেমান পোপ তৃতীয় লিওর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য রোমে যান। পূর্বে শার্লেমান একবার পোপ তৃতীয় লিওর জীবনরক্ষা করেছিলেন। অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়ে গেলে শার্লেমান যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে সেণ্ট পিটার্স গির্জায় প্রার্থনা করতে যান। প্রার্থনা শেষ হ'লে পোপ তৃতীয় লিও হঠাৎ শার্লেমানের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন এবং তাঁকে রোম সম্রাট ব'লে ঘোষণা করেন। এইভাবে পুনরায় পশ্চিম ইউরোপে রোম


শার্লেমানের সাম্রাজ্য
অ্যাংলো স্যাক্সন
স্যাক্সনি
বাভেরিয়া
ক্যারিন্থিয়া
লোম্বার্ডি
বারগান্ডি
প্যারিস
গ্যাসকনি
ব্রিটেন
রোম
স্পেন

সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়। এই সাম্রাজ্য গির্জা থেকে পোপ-কর্তৃক ঘোষিত হওয়ায় পরে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়েছিল।

শার্লেমানের জনহিতকর কার্যাবলী ঃ শার্লেমান রোমান চার্চের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। তিনি চার্চের পরিচালন-ব্যবস্থায় নানা সংস্কারসাধন করেন। ঐসময়ে ধর্ম-যাজকরা অনেকেই অশিক্ষিত ছিলেন। তিনি তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ধর্মযাজকদের বিবাহ, বিলাস-ব্যসন, অস্ত্রধারণ ও শিকার নিষিদ্ধ হয়। এমনকি গির্জায় উপদেশদান ও উপাসনা-সঙ্গীত প্রভৃতিতেও শার্লেমান অনেক পরিবর্তন করেন।

তিনি সুশাসনের জন্য তাঁর সাম্রাজ্যকে অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তাঁর অধীন সামন্তরা ঐসব প্রদেশ শাসন করলেও তিনি শাসনকার্য ও চার্চের কাজকর্ম দেখার জন্য দুজন ক'রে রাজপ্রতিনিধি পাঠাতেন। এই রাজপ্রতিনিধিদের একজন হতেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং অপরজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজক। শার্লেমান তাঁর প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর অধীন সামন্তদের গির্জা ও বিদ্যালয় স্থাপন এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য করতে বাধ্য করেন।

শার্লেমানের বিদ্যোৎসাহ ঃ শার্লেমান প্রথম জীবনে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিদ্যোৎসাহ এতই ছিল যে, তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় লেখা বই পড়তে শেখেন এবং লেখা অভ্যাস করতে থাকেন। শোনা যায়, তিনি রাত্রিতে বালিশের নীচে লেখার সরঞ্জাম রাখতেন। খেতে খেতে ইতিহাস প্রভৃতি শুনতেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষাদানের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে পণ্ডিতদের আনাতেন। তিনি গির্জা ও মঠগুলিতেও বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তাঁর রাজধানী জার্মানির আকেন শহরে যে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তাতেও বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি তৎকালীন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অ্যালকুইনকে ইংল্যাণ্ড থেকে আনিয়ে

নিজের পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেছিলেন। শার্লেমান কেবল একটি বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তোলেননি, সেই অজ্ঞতা ও অশিক্ষার যুগে তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তুলেছিলেন। তাই তিনি যে 'গ্রেট' বা মহান আখ্যা পেয়েছিলেন, তা অকারণ ছিল না।

৩. অভিষেকের গুরুত্ব—রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক

ফ্রান্স ও জার্মানির উদ্ভব : ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্লেমানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর পৌত্রদের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে, তাতে তাঁর একপৌত্র জার্মানির এবং এক পৌত্র ফ্রান্সের রাজা হন। এইভাবে ইউরোপে **ফ্রান্স ও জার্মানি** নামে দুটি পৃথক রাজ্য দেখা দেয়। ফ্রান্সে রোমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় ল্যাটিন ও ফ্রাঙ্ক-ভাষার মিশ্রণে ফরাসী ভাষার উদ্ভব হয়; আর জার্মানিতে জার্মান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় সেখানে জার্মান ভাষাই প্রাধান্য পায়।

শার্লেমানের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার সুযোগে জার্মানিতে বহু সামন্ত রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল এবং উত্তর থেকে দুর্ধর্ষ নর্স্‌ম্যান (নরম্যান) ও ডেন্‌রা এবং পূর্বদিক থেকে বোহেমিয়ান, স্লাভ প্রভৃতি জাতির লোকেরা ও মাগিয়াররা (হাঙ্গেরিয়ান) জার্মানিতে হানা দিচ্ছিল। জার্মানির সামন্তরা এইসব আক্রমণ ঠেকাতে অসমর্থ হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে স্যাক্‌সনির সামন্তরাজ হেনরিকে জার্মানির রাজা নির্বাচিত করেন। রাজা হেনরি বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে জার্মানিতে একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র **অটো** রাজা হন। তিনি জার্মানির সামন্তদের দমন ক'রে সমগ্র জার্মান রাজ্যে অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তিনিও ইতিহাসে 'মহান্' আখ্যা পেয়েছেন।

পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন : শার্লেমানের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর রোমান চার্চের আবার দুর্দিন শুরু হয়। নর্স্‌ম্যান, মাগিয়ার, স্লাভ, আরব প্রভৃতি জাতির আক্রমণে রোমান

চার্চ বিপন্ন বোধ করেছিল। তাছাড়া, রোমান চার্চ বিভিন্ন অঞ্চলের বিশপদের ওপরেও তার প্রাধান্য হারিয়েছিল। স্থানীয় সামন্ত রাজারা নিজ নিজ সুবিধামতো বিশপ নিয়োগ করত। রোমেও স্থানীয় সামন্তরা পোপ নির্বাচনে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল।

এইরূপ অবস্থায় একদিন রোমান চার্চ সম্রাট শার্লেমানের শরণাপন্ন হয়েছিল। এখন পোপ দ্বাদশ জন জার্মানির রাজা অটোর শরণাপন্ন হলেন। ইতালির সীমান্তবর্তী জার্মান্ সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে ঐসময় গৃহযুদ্ধ চলছিল। রাজা অটো তা দমন করলেন এবং উত্তর ইতালি অধিকার ক'রে নিলেন। ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে অটো রোমে গেলে পোপ দ্বাদশ জন তাঁকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করলেন। এইভাবে পবিত্র রোম সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত হ'ল। অবশ্য, ফ্রান্স এই রোম সাম্রাজ্যের বাইরে রইল। এর প্রধান অংশ ছিল জার্মানি, অষ্ট্রিয়া ও ইতালি। এই পবিত্র রোম সাম্রাজ্য, নামে হ'লেও, আট শ বছরেরও বেশী সময় স্থায়ী হয়েছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভ্যুত্থানের ফলে এর বিলুপ্তি ঘটে।

অভিষেকের গুরুত্বঃ পূর্বে যেসব সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, সেসব সাম্রাজ্যের সম্রাটরা হয় বাহুবলে, নয় উত্তরাধিকারসূত্রে সম্রাট হয়েছিলেন। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবিত রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটরা—শার্লেমান ও অটো—পোপ কর্তৃক সম্রাট ব'লে ঘোষিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ রোমান চার্চই তাঁদের সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেছিল। এর ফলে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এঁদের সম্রাট-পদ রোমান চার্চেরই দান। সুতরাং সম্রাট প্রধান, না রোমান চার্চ প্রধান, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। সম্রাট শার্লেমান বা সম্রাট অটোর সময়ে এই প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, তাঁরা ছিলেন পরাক্রান্ত সম্রাট।

রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্কঃ মধ্যযুগে যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত ছিল, তাতে দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন রাজা। রাজা ঐ সম্পত্তি তাঁর অধীন সামন্তদের বশ্যতা ও আনুগত্যের বিনিময়ে দিতেন এবং সামন্তরাও তা বশ্যতা ও আনুগত্যের শপথ

নিয়ে নিতেন। একে বলা হ'ত ইন্‌ভেস্টিচার বা অধিকার-দান। রোমান চার্চও বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক ছিল। এই ভূসম্পত্তি নেওয়ার সময়ে তাকে রাজার কাছে বশ্যতা ও আনুগত্যের শপথ নিতে হ'ত। এদিক থেকে বিচার করলে রাজাই ছিলেন প্রভু, আর চার্চ—পোপ, বিশপ প্রভৃতি ধর্মযাজকরা—সকলেই ছিলেন তাঁর অনুগত।

কিন্তু অন্যদিক থেকে চার্চ ছিল বলীয়ান। চার্চ যেমন রাজাদের সম্রাটপদে অভিষিক্ত করত, তেমনি সম্রাটকে বা রাজাকে সমাজচ্যুত ও ধর্মচ্যুত ব'লে ঘোষণা করতে পারত। সম্রাট বা রাজা সমাজচ্যুত ও ধর্মচ্যুত হ'লে তাঁর বিরুদ্ধে সামন্তরা বিদ্রোহ করলে তা অন্যায় বিবেচিত হ'ত না। সমাজচ্যুত ও ধর্মচ্যুত রাজার রাজ্যের প্রজারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হ'ত।

কিন্তু চার্চ ও রাষ্ট্র উভয়ে উভয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। চার্চ যেমন শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্রাট বা শক্তিশালী রাজাদের ওপর নির্ভর করত, তেমনি নিজেদের অধিকারকে বৈধ ও ঈশ্বরদত্ত প্রমাণ করার জন্য সম্রাট বা রাজাদের চার্চের অনুমোদন নিতে হ'ত।

গোড়ার দিকে সম্রাট, রাজা এমনকি শক্তিশালী সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় বিশপদের নিযুক্ত করতেন, তাদের আনুগত্যের শপথের বিনিময়ে ভূসম্পত্তি দিতেন। এমনকি পোপকেও সম্রাটই নিয়োগ করতেন, পোপের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সম্রাট তার বিচার করতেন। কিন্তু সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে চার্চ এইসব বিষয়ে সম্রাটদের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করল। এইভাবে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল। এই দ্বন্দ্ব ও তিক্ততা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অনেক সময় চার্চের প্রভুত্ব স্বীকার না করায় সম্রাট ধর্মচ্যুত ব'লে ঘোষিত হতেন এবং পরে অনুতাপ ক'রে নগ্নপদে নতমস্তকে পোপের মার্জনা ভিক্ষা করতেন। আবার অনেক সময় শক্তিশালী সম্রাটরা রোম আক্রমণ ক'রে পোপকে বিতাড়িত ক'রে

নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। অনেক সময় সম্রাট ও চার্চ আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে পরস্পরের সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ রাখার চেষ্টা করতেন।

৪. খ্রীষ্টান মঠ ও সেগুলির ভূমিকা

মঠ স্থাপনের কারণঃ খ্রীষ্টানরা গোড়ার দিকে সকলেই মানব-কল্যাণের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ ছিল। তাই সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন বহু খ্রীষ্টান যাজককে রাজকার্যে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, সরকারী উচ্চপদ লাভের আশায় বহু সুযোগসন্ধানী লোক যাজকরূপে খ্রীষ্টান চার্চে যোগ দিয়েছে এবং চার্চে স্বার্থপর, লোভী ও নীচ চরিত্রের বহুলোক যাজকরূপে ঢুকে পড়েছে। এতে প্রকৃত ধর্মপরায়ণ খ্রীষ্টানরা ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁদের অনেকে যাজকরূপে চার্চে প্রবেশ না ক'রে সন্ন্যাস নিলেন এবং অরণ্যে, মরুভূমিতে, পর্বতগুহায় বা পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে গিয়ে কঠোর সংযম পালন ক'রে ধর্মসাধন করতে লাগলেন।

কিন্তু অনেক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী আবার জনসমাজ ত্যাগ ক'রে এইভাবে ধর্মসাধনা পছন্দ করলেন না। তাঁরা দেখলেন, মানুষের মধ্যে না থাকলে মানুষের সেবা করা যায় না, অথচ মানবপ্রেম ও মানবসেবাই ছিল খ্রীষ্টধর্মের প্রধান আদর্শ। তাই তাঁরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মতোই মঠ স্থাপন ক'রে ঈশ্বরের উপাসনা, ব্রহ্মচর্য পালন ও জনসেবার কাজে ব্রতী হলেন এবং দেশে বহু মঠ গ'ড়ে তুললেন।

এঁদের আদর্শ, চরিত্র, ধর্মপ্রাণতা এবং জনহিতকর কার্য দেশের বহু ধনী জমিদার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজা-রাজড়াকে অনুপ্রাণিত করল। তাঁরা মঠগুলিকে প্রচুর জমি ও অর্থ দান করলেন। নিজেরাও অনেকে সন্ন্যাসী হয়ে মঠে যোগ দিলেন। দেখতে দেখতে মঠগুলির ভূসম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো। সন্ন্যাসীরা নিজেরাই ঈশ্বর-

উপাসনা ও ধর্মসাধনার অবকাশে এইসব ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন, উৎপন্ন শস্য থেকে নিরন্নকে অন্নবস্ত্র ও সাহায্য দিতেন।

মঠবাসী সন্ন্যাসীরা মানুষের দুঃখে-দৈন্যে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন, অনাথদের জন্য আশ্রম গড়ে তুললেন, রোগীর চিকিৎসা ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষা-বিস্তারের কাজেও মন দিলেন। মঠে মঠে গ্রন্থশালা ও শিক্ষালয় গড়ে তুললেন, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন, বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুলিপি করলেন। এইভাবে সেই অজ্ঞতা ও অশিক্ষার যুগে জ্ঞানের বর্তিকা প্রজ্বলিত রাখলেন।

তাঁরা অন্যান্য অসংখ্য জনহিতকর কার্যেও আত্মনিয়োগ করলেন। জনসাধারণের সুবিধের জন্য পথঘাট ও সেতু নির্মাণ করলেন, খাল-নালা কেটে জলনিকাশ ও কৃষির উন্নতি ঘটালেন, বন কেটে বহু নতুন কৃষিক্ষেত্র রচনা করলেন, এমনকি মাঠের ক্ষেত-খামারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে চাষ-আবাদে ও পশুপালনে উৎপাদন-বৃদ্ধির নানা কৌশলও আবিষ্কার করলেন।

এইভাবে মধ্যযুগে খ্রীষ্টান মঠগুলি এক অভাবনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল।

৫. খ্রীষ্টান মঠগুলির সংগঠন : সেণ্ট বেনেডিক্ট

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের মঠ : মঠগুলি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তারে সকল দিক থেকে সহায়ক হয়েছিল। প্রাচীনকালে নারীদের স্বাধীনতা ব'লে কিছুই ছিল না। কিন্তু মঠগুলিতে স্ত্রীলোকরাও সন্ন্যাসিনীরূপে যোগ দেন। সন্ন্যাসিনীদের জন্য পৃথক মঠ গ'ড়ে ওঠে এগুলি স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিস্তারে সহায়ক হয়।

মঠবাসী সন্ন্যাসীদের বলা হ'ত মঙ্ক (monk), সন্ন্যাসিনীদের বলা হত নান (nun)। সন্ন্যাসীদের মঠকে বলা হত মনাস্টারি, আর সন্ন্যাসিনীদের মঠকে বলা হ'ত নানারি। সন্ন্যাসীদের মঠের

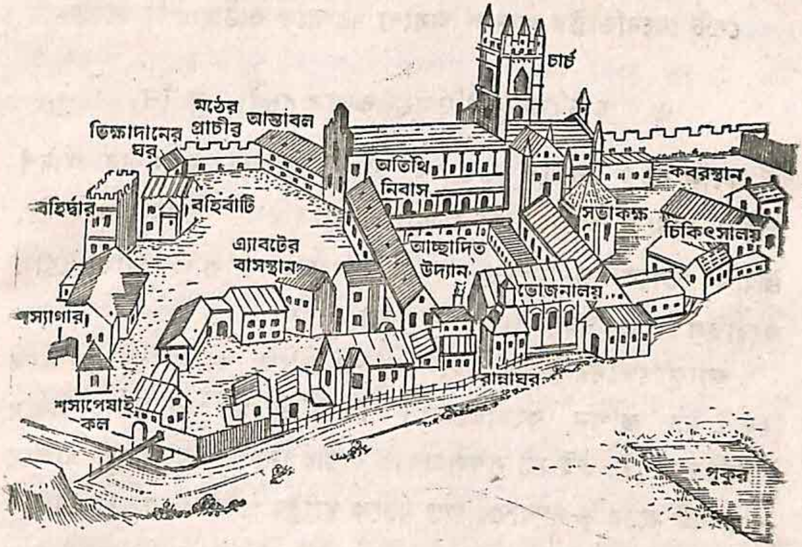
অধ্যক্ষকে বলা হ'ত অ্যাবট, আর সন্ন্যাসিনীদের মঠের অধ্যক্ষাকে বলা হ'ত অ্যাবেস।

মঠবাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ঃ বহু শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী আপন আপন প্রতিভাবলে বহু মঠ ও সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। ঐসব সম্প্রদায়ের আদর্শ ও জীবনধারা মূলত এক হ'লেও সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীদের নাম অনুসারে এইসব মঠ ও সম্প্রদায়ের নাম হ'ত। যেমন, বেনেডিক্টাইন, সিস্টারসিয়ান, ফ্রান্সিস্‌কান, ডেমিনিকান, ইত্যাদি।

সেণ্ট বেনেডিক্টঃ মঠবাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত ছিল বেনেডিক্টাইন সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন সেণ্ট বেনেডিক্ট। তিনি মঠবাসীদের জীবনযাত্রাপদ্ধতির ও মঠ সংগঠনের মূল আদর্শ ও রীতিনীতিগুলি প্রবর্তিত করেন।

সেণ্ট বেনেডিক্ট ৪৮০ থেকে ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। তিনি ইতালির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সামাজিক অধঃপতন তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তোলে। তিনি সংসার ও জনসমাজ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হন। ঐসময়ে রোম থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে সুবিয়াকোতে এক পার্বত্য খাতের প্রান্তে সম্রাট নরো-নির্মিত জঙ্গলে পরিপূর্ণ পরিত্যক্ত এক প্রাসাদ ছিল। ঐ প্রাসাদের অদূরে একটি দুর্গম গভীর গিরিগুহায় বেনেডিক্ট তিন বছর ভারতীয় তপস্বীদের মতো কঠোর তপশ্চর্যা করেন। ঐ স্থান এতই দুর্গম ছিল যে, সেখানে নিয়মিত খাদ্য পৌঁছানোও ছিল দুষ্কর। বেনেডিক্টের এক ভক্ত মাঝে মাঝে দড়িতে বেঁধে কিছু খাবার ঐ গভীর গুহায় নামিয়ে দিতেন। বেনেডিক্টের এই কঠোর তপশ্চর্যার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই তপশ্চর্যা ও আত্মপীড়নে তিনি বেশীদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। শেষে তিনি মানুষের মাঝে থেকে মানুষের সেবাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধন মনে করেন।

তিনি সুবিয়াকো ছেড়ে মন্ট ক্যাসিনোতে গিয়ে একটি মঠ স্থাপন করেন। এই মঠ অল্প কালের মধ্যেই বিখ্যাত হয়ে ওঠে।



একটি বেনেডিক্টাইন মঠের ছবি

তিনি মঠবাসীদের ঈশ্বর-উপাসনা ও সংযত পবিত্র জীবন যাপনের সঙ্গে কঠোর শ্রমে আত্ম-নিয়োগ করতে বলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের দৈনন্দিন জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—উপাসনা, শ্রম ও বিদ্যাচর্চা। তিনি আর্তের সেবায় সন্ন্যাসীদের আত্ম-নিয়োগ করতে বলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের সংযম পালন করতে বলেন, কিন্তু তা যেন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়। তিনি মঠবাসীদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার ওপর



খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী পুঁথি নকল করছেন

জোর দেন। মঠাধ্যক্ষ বা উচ্চতম পদাধিকারী সন্ন্যাসীর আদেশ পালন, কৌমার্যপালন এবং আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অবশ্যকর্তব্য ছিল।

সেণ্ট বেনেডিক্টের আদর্শে অসংখ্য মঠ গড়ে ওঠে।

৬. চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা— ক্লানি

ক্লানি মঠ : খ্রীষ্টান মঠগুলির ত্যাগ, শুচিতা ও সেবার আদর্শ খ্রীষ্টান চার্চকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কেবল তাই নয়, খ্রীষ্টান চর্চাকে দুর্নীতিমুক্ত করার কাজেও সেগুলি আত্মনিয়োগ করেছিল। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল ক্লানি মঠ।

অ্যাকুইতেনের ডিউক উইলিয়াম পূর্ব ফ্রান্সে বারগাণ্ডির ক্লানিতে একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ঐ মঠ প্রতিষ্ঠার সনদে বলেছিলেন যে, এই মঠ সকলপ্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং এই মঠের ভূ-সম্পত্তির জন্য মঠকে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হবে না। এর ফলে বহু ধনী ব্যক্তি ক্লানি মঠের জন্য দান করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এই ধনসম্পদ দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ক্লানি মঠের শাখা-প্রশাখা খোলা সম্ভব হয়েছিল। বহু পুরাতন মঠও এই মঠের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মঠের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এইভাবে ক্লানি মঠের আদর্শ ও আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ক্লানি মঠের আন্দোলন : ক্লানি মঠ চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিল। ঐসময়ে চার্চগুলি প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় যাজকরা প্রায়ই বিলাস-ব্যসনে ও ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতেন। ক্লানি মঠ-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেছিল। বলা হয়েছিল, সকল যাজককে কৌমার্যব্রত নিতে হবে, কারও কাছে ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি দানরূপে গ্রহণ চলবে না। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে ধর্মযাজকের পদ বিক্রি করা হ'তো, ক্লানি তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিল।

ক্লানি আন্দোলন চার্চকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে চেয়েছিল। সেজন্য ধর্মযাজকদের ওপর একমাত্র পোপের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা দাবি করা হয়েছিল। পোপ-নির্বাচনেও সম্রাট ও সামন্তদের হস্তক্ষেপ বা প্রভাব-বিস্তার বন্ধ করতে বলা হয়েছিল। ঐ সময়ে চার্চের ওপর রাষ্ট্রের যেরকম প্রাধান্য ছিল, তাতে এই আন্দোলন নিশ্চয় দুঃসাহসিক ছিল।

আন্দোলনের সাফল্য ও প্রভাব : ক্লানি মঠের এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এবং জনসাধারণের মনেও সাড়া জাগিয়েছিল। এই মঠের অন্যতম সন্ন্যাসী হিল্‌ডেব্রাণ্ড পোপদের পরামর্শদাতারূপে দীর্ঘকাল কাজ করেছিলেন এবং পোপদের ক্লানি আন্দোলনের আদর্শগুলিকে গ্রহণ করিয়েছিলেন। পরে, ১০৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি নিজে সপ্তম গ্রেগরি নামে পোপ হয়েছিলেন এবং এইসব আদর্শকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সময়কার সম্রাট চতুর্থ হেনরি চার্চের প্রাধান্য অস্বীকার করলে তিনি চতুর্থ হেনরিকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করেছিলেন। এতে নানাদিক থেকে চতুর্থ হেনরি বিপন্নবোধ করেন এবং অনুতপ্তচিত্তে পোপের মার্জনা ভিক্ষা করেন। ঐ সময়ে পোপ সপ্তম গ্রেগরি কানোসা প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তিনি মর্জনা করার আগে চতুর্থ হেনরিকে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে প্রাসাদের বাইরে তিনদিন অপেক্ষা করিয়েছিলেন। অবশ্য, চতুর্থ হেনরি পরে এর শোধ নিয়েছিলেন, রোম আক্রমণ ক'রে সপ্তম গ্রেগরিকে বিতাড়িত ক'রে।

কিন্তু চার্চের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ক্লানি মঠ যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তা ব্যর্থ হয়নি। চার্চের ওপর সম্রাটদের প্রাধান্য অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছিল।

৭. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে চার্চ ও মঠগুলির ভূমিকা : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠা

চার্চ ও মঠগুলি মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিদ্যা-বিস্তারের

কেন্দ্র ছিল। চার্চ ও মঠগুলির উদ্যোগে কেবল বিদ্যালয় নয়, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছিল। সকল শ্রেণীর, বিশেষত দরিদ্র শ্রেণীর ছাত্ররা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চার্চের ও মঠের বিদ্যালয়গুলিতে এসে জড়ো হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে এইসব জ্ঞানপিপাসু ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য অধ্যাপকরা সংঘ গড়ে তুলতেন। অনেক সময় ছাত্ররা সংঘবদ্ধ হয়ে অধ্যাপকদের পারিশ্রমিক দিয়ে বিদ্যালাভ করত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল আবাসিক। ছাত্ররা অধ্যাপকদের সঙ্গে বাস করত। বড় বড় কক্ষে তারা একসঙ্গে থাকত এবং তৃণাসনে বসে অধ্যাপকদের কাছে পাঠ নিত। ঐ সময়ে ছাপার ব্যবস্থা না থাকলেও হাতে লেখা পুঁথির অভাব ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থশালায় বহু পুঁথি ও পুঁথির অনুলিপি থাকত। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জননীরূপে দেখত এবং নিজেদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ অনুভব করত।



বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা

ঐ যুগে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড ও পরে কেমব্রিজে, ফ্রান্সের প্যারিসে, জার্মানির হাইডেল্‌বার্গে, ইতালির বলোনিয়ায় ও সালের্নোতে এবং স্পেনের কর্ডোভায় বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিল। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তুলেছিল আরবরা। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে সাহিত্য, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি পড়ানো হ'ত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় আবার বিশেষ বিষয়ের জন্য

বিখ্যাত ছিল। যেমন, ধর্মতত্ত্ব পড়ানোয় প্যারিস, আইন পড়ানোয় বলোনিয়া এবং চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানোয় সালের্নো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিখ্যাত।

ঐ যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতঃ এই যুগের পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিলেন পিটার আবেলার্ড (১০৭৯-১১৪২), অ্যালবের্টিয়াস ম্যাগ্নাস (১১৯৩-১২৮০), টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫-১২৮৭) এবং রোজার বেকন (আঃ ১২১০-১২৯৩)। কর্ডোভার বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ছিলেন ইব্‌ন্‌ রশিদ্‌ (১১২৭-১১৯৮)।

অনুশীলনী

১। ফ্রাঙ্করা কোথায় রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিল? ফ্রাঙ্কদের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা কে ছিলেন?

২। চার্ল্‌স্‌ মার্টেল কে ছিলেন? ইউরোপের ইতিহাসে তাঁর নাম কিজন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়েছে?

৩। পেপিন কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। শার্লেমানের রাজ্যলাভ ও রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। শার্লেমান কিভাবে 'সম্রাট' উপাধি পেয়েছিলেন? এর ফলাফল কি হয়েছিল?

৬। শার্লেমান শব্দের অর্থ কি? শার্লেমানের 'মহান্‌' উপাধিটি উপযুক্ত হয়েছিল কি? তোমার মতের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৭। কিভাবে ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়েছিল?

৮। সম্রাট অটো কে ছিলেন? তিনি কিভাবে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়েছিলেন?

৯। ফ্রান্স ও জার্মানির উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল?

১০। পোপ সম্রাটদের অভিষিক্ত করায় কি প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল? এর ফল কি হয়েছিল?

১১। পোপ সপ্তম গ্রেগরি চার্চের প্রাধান্য প্রমাণের জন্য কি করেছিলেন? সম্রাট চতুর্থ হেনরির সঙ্গে তাঁর বিবাদের ফল কি হয়েছিল?

১২। খ্রীষ্টান মঠগুলির উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিল? খ্রীষ্টান মঠগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিবরণ দাও।

১৩। সেন্ট বেনেডিক্ট সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৪। সেন্ট বেনেডিক্ট-প্রতিষ্ঠিত মঠ ও সম্প্রদায় কি নামে পরিচিত? সেন্ট বেনেডিক্ট মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য কি নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছিলেন?

১৫। ক্লানি মঠের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কি জান? ক্লানি মঠ কি কি বিষয়ে আন্দোলন করেছিল? তাতে কতখানি সফল হয়েছিল?

১৬। মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিভাবে গড়ে উঠেছিল? ঐগুলিতে পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও ছাত্রদের সম্পর্ক কেমন ছিল?

১৭। মধ্যযুগের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েকজন সুবিখ্যাত পণ্ডিতের নাম কর।

১৮। সংক্ষিপ্ত টিকা লেখ: চার্ল্‌স্ মার্টেল; পেপিন; সম্রাট অটো; হিল্‌ডেব্রাণ্ড; সম্রাট চতুর্থ হেনরি।

১৯। শূন্যস্থান পূরণ কর: (ক) ফ্রাঙ্কদের রাজ্য এখনকার—ও—-তে গড়ে উঠেছিল। ক্লভিসের বংশের শেষ রাজাকে বিতাড়িত ক'রে—রাজা হন। পেপিনের দুই পুত্র,—ও—।

(খ) পেপিনের পুত্র — শার্লেমান নামে পরিচিত। শার্লেমান শব্দের অর্থ — —। পোপ — — তাঁকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা করেন। এইভাবে — — সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

(গ) সেন্ট বেনেডিক্ট — থেকে — খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি রোমের পঁচিশ মাইল দূরে — -তে এক গভীর গিরিগুহায় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেন। পরে তিনি — -তে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে সম্প্রদায় গ'ড়ে তোলেন, তা — সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। ফ্রাঙ্ক রাজ্য প্রথমে কোথায় গড়ে উঠেছিল?

২। ক্লভিসের বংশধরদের বিতাড়িত ক'রে কে রাজা হয়েছিলেন?

৩। শার্লেমান নামের অর্থ কি?

৪। কোন্ পোপ শার্লেমানকে রোম সম্রাট ব'লে ঘোষণা করেছিলেন?

৫। শার্লেমানের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁর সাম্রাজ্য কোন্ কোন্ দুই প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল?

৬। সেণ্ট বেনেডিক্ট মঠবাসী সন্ন্যাসীদের জন্য কি কি কর্তব্য নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন?

৭। ক্লানি কোথায় অবস্থিত? ক্লানি মঠ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

৮। হিল্‌ডেব্রাণ্ড কে ছিলেন? তিনি কি নামে পোপ হয়েছিলেন?

৯। কোন্ পোপ সম্রাট চতুর্থ হেনরিকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা করেছিলেন?

১০। কোন্ পোপকে সম্রাট চতুর্থ হেনরি রোম থেকে বিতাড়িত করেছিলেন?

১১। মধ্যযুগের কয়েকটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর।

১২। 'নানারি' বলতে কি বোঝ?

১৩। বেনেডিক্টাইন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?

মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র ৭

১. সামন্ততন্ত্র—সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

সামন্ততন্ত্রের অর্থঃ তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতির কথা পড়েছ। ঐসব শাসন-ব্যবস্থায় রাজা, অভিজাতশ্রেণী বা জনসাধারণের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু মধ্যযুগে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাতে সামন্তদের প্রাধান্য ছিল। তাই ঐ শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় সামন্ততন্ত্র।

বাংলায় যাকে সামন্ততন্ত্র বলা হয়, তাকে ইংরেজিতে বলা হয় ফিউড্যালিজম্ (Feudalism)। ফিউড্যালিজম্ কথাটি ইংরেজি ফিউড (Feud) শব্দ থেকে এসেছে। 'ফিউড' শব্দের অর্থ আনুগত্যের অঙ্গীকারে প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি। যারা ঐভাবে ভূসম্পত্তি পায়, তাদের বলা হয় ফিউড্যাল লর্ড (Feudal Lord) বা

সামন্ত-প্রভু। ফিউড্যালিজম্ বা সামন্ততন্ত্রে এইসব ফিউড্যাল লর্ড বা সামন্ত-প্রভুদের প্রাধান্য থাকে।

ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব : বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে দেশে অরাজকতা দেখা দিল। শত্রুর আক্রমণে মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা রইল না। জোর যার মুলুক তার, এই নীতি সর্বত্র প্রচলিত হ'ল। এই অবস্থায় মানুষ নিজের স্বাধীনতার বিনিময়েও জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্য স্থানীয় বীর-পুরুষদের শরণাপন্ন হল। ঐসব স্থানীয় বীরপুরুষ আনুগত্যের বিনিময়ে ঐসব লোককে জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার ভরসা দিলেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও নিরাপদ ছিলেন না। তাই তাঁরাও তাঁদের চেয়ে দুর্ধর্ষ বীরদের শরণাপন্ন হলেন। ঐসব দুর্ধর্ষ বীররাও আনুগত্যের বিনিময়ে ওঁদের রক্ষার ও সাহায্যের ভরসা দিলেন। ঐসব দুর্ধর্ষ বীরদেরও তাঁদের চেয়েও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। ওঁরাও আনুগত্যের বিনিময়ে রক্ষা ও সাহায্যের ভরসা পেলেন। এইভাবে স্তরে স্তরে বিভিন্ন মর্যাদার সামন্ত প্রভুর দল গড়ে উঠল।

এই ব্যাপারটা যেমন নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে ঘটেছিল, তেমনি ওপর থেকে নিচের দিকেও ঘটেছিল। কোন উপজাতির দলপতি যখন তাঁদের বীর অনুগামী ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুবিশাল অঞ্চল বা রাজ্য জয় করেছিলেন, তখন তিনিও আনুগত্যের বিনিময়ে ঐ অঞ্চলের বা রাজ্যের ভূ-সম্পত্তি তাঁর প্রধান অনুগামীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। ঐসব প্রধান অনুগামী হয়েছিলেন প্রধান প্রধান সামন্ত-প্রভু। এঁদের স্থান ছিল রাজাদের নিচেই।

এইসব প্রধান সামন্ত-প্রভু আবার তাঁদের ভূ-সম্পত্তিকে আনুগত্যের বিনিময়ে তাঁদের সহযোগীদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। ঐসব সহযোগীরাও আবার তাঁদের প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তিকে আনুগত্যের বিনিময়ে ভাগ ক'রে দিতেন তাঁদের অনুগত বীর যোদ্ধাদের মধ্যে। এইভাবে দেশে স্তরে স্তরে প্রধান সামন্ত থেকে ক্ষুদ্রতম সামন্তদের উদ্ভব হ'ত।

২. ভূমি-ব্যবস্থা—মানুষে মানুষে সম্পর্ক—

সামন্ততান্ত্রিক স্তরবিন্যাস

ভূমিব্যবস্থা : সামন্ততন্ত্রে ধরে নেওয়া হ'ত, রাজাই রাজ্যের সব ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে ঐ ভূ-সম্পত্তি পেয়েছেন। প্রধান সামন্তরা আনুগত্য, কর ও যুদ্ধকালে সামরিক সাহায্যদানের অঙ্গীকারে ভূ-সম্পত্তি পেয়েছেন রাজার কাছ থেকে। সামন্তরা আবার পেয়েছেন উর্ধ্বতন সামন্তদের কাছ থেকে তাঁদের ভূসম্পত্তি। সামন্তরা তাঁদের প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি আনুগত্য, কর ও শ্রমের বিনিময়ে সাধারণ মানুষকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

মানুষে মানুষে সম্পর্ক : শীর্ষস্থানে ছিলেন রাজা। তিনি ছিলেন সামন্ত ও জনসাধারণের সকলের প্রভু। আর সর্বনিম্নে ছিল অগণিত জনসাধারণ। মধ্যে ছিল সামন্ত-প্রভুরা। সামন্তদের ছিল দুটি ক'রে সম্পর্ক। এরা একই সঙ্গে ছিল উর্ধ্বতন রাজা ও সামন্ত-প্রভুর ভ্যাসাল (Vassal) বা অনুগত ব্যক্তি এবং নিম্নতন সামন্ত বা প্রজাদের লর্ড (Lord) বা প্রভু। এঁদের রাজা বা উর্ধ্বতন সামন্ত-প্রভুর কাছ থেকে নতজানু হয়ে আনুগত্য, কর ও সামরিক সাহায্য-দানের অঙ্গীকারের বিনিময়ে ভূসম্পত্তি নিতে হ'ত। এঁরা হতেন রাজার বা উর্ধ্বতন সামন্ত-প্রভুর ভ্যাসাল বা অনুগত ব্যক্তি। এঁরা আবার, অন্যপক্ষে, নতজানু নিম্নতন সামন্ত বা প্রজার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আনুগত্য, কর ও সামরিক সাহায্য দানের অঙ্গীকারের বিনিময়ে দিতেন ভূ-সম্পত্তি। এইভাবে এঁরা হতেন নিম্নতন সামন্ত ও প্রজাদের প্রভু। এইভাবে সামন্তরা সকলেই একই সঙ্গে আনুগত্য ও প্রভুত্বের দ্বৈত বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

ভ্যাসালরা কেবল তাঁর লর্ড বা প্রভুকে সামরিক সাহায্যই দিতেন না, তাঁরা তাঁদের প্রভুর দরবারে উপস্থিত থাকতেন ও প্রভুকে নানাবিষয়ে পরামর্শ দিতেন। প্রভু শত্রুহস্তে বন্দী হ'লে মুক্তি-পণ দিয়ে তাঁরা প্রভুকে মুক্ত করতেন। তাঁরা প্রভুর কন্যার বিবাহে

উপযুক্ত যৌতুক দিতেন এবং প্রভুর পুত্রের 'নাইট' হওয়ার সময়ে অর্থ দিতেন। সামন্ত-প্রভুরা ভ্যাসালদের রক্ষা করতেন। তাঁরা ভ্যাসালদের পুত্রকে নিজ পরিবারে রেখে নাইট হওয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন।

সামন্ততান্ত্রিক স্তরবিন্যাস : সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রধান সামন্ত-প্রভুরা ডিউক, আর্চডিউক, প্রিন্স প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা অনেক সময় প্রায় স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতেন, অনেক সময় রাজ-সিংহাসনও অধিকার করতেন, অনেক সময় অন্যান্য সামন্তদের দ্বারা রাজা নির্বাচিত হতেন।

এঁদের নীচে ছিলেন আর্ল, কাউন্ট প্রভৃতি শ্রেণীর সামন্তরা। আর সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন ব্যারন, ব্যারনেট, নাইট প্রভৃতি সামন্তরা।

৩. জনজীবনে সামন্তদের প্রভুত্ব

বিচার ও শাসন-ব্যবস্থা : দেশের সমাজ ও শাসন-ব্যবস্থার উচ্চতম শিখরে রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু রাজা নিজের কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনী দিয়ে রাজ্য শাসন করতেন না। সামন্ত-প্রভুদের নিজ নিজ এলাকায় ছিল সর্বময় কর্তৃত্ব। তাঁরা নিজেরাই আইন করতেন, বিচার করতেন। প্রজাদের বিচারের জন্য সামন্ত-প্রভুদের ম্যানর হাউসে বা বাস-ভবনে বসত আদালত। সামন্ত-প্রভু বা তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় কর্মচারীরা প্রজাদের বিচার করতেন।

সামন্ত-প্রভুরা তাঁদের ভূ-সম্পত্তি ও চাষবাস দেখাশোনা ও জমিদারিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কর্মচারী রাখতেন। এইসব কর্মচারীর প্রধানকে বলা হত সেনেশ্চল বা স্টিউয়ার্ড। সামন্ত-প্রভুদের বহু জমিদারি থাকত। সেনেশ্চল বা স্টিউয়ার্ডরা সামন্ত-প্রভুদের প্রতিনিধিরূপে কয়েকটি জমিদারির কর্তৃত্ব করতেন।

প্রতি জমিদারিতে থাকতেন এক-একজন বেলিফ। তাঁরা ঐ জমিদারিতে সেনেশ্চল বা স্টিউয়ার্ডের অধীনে সামন্ত-প্রভুর

প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাঁরা সামন্ত-প্রভুদের খাসজমির চাষ-আবাদ দেখাশুনা করতেন, ভূমিদাসদের খাটাতেন।

এ ছাড়াও সামন্ত-প্রভুদের বহু কর্মচারী থাকত।

নিজ নিজ এলাকায় শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করতেন সামন্তরা। শত্রুর আক্রমণ ও দস্যুতস্করের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষার দায়িত্বও ছিল তাঁদের। প্রতি জমিদারিতে তাঁদের সুরক্ষিত বাসভবন থাকত। এগুলি শত্রুর আক্রমণকালে সকলের আশ্রয় হয়ে উঠত। আর থাকত লৌহ-বর্মপরিহিত অশ্বারোহী যোদ্ধার দল। তারা শত্রুর আক্রমণ এবং দস্যু-তস্কর ও অপরাধীদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করত।

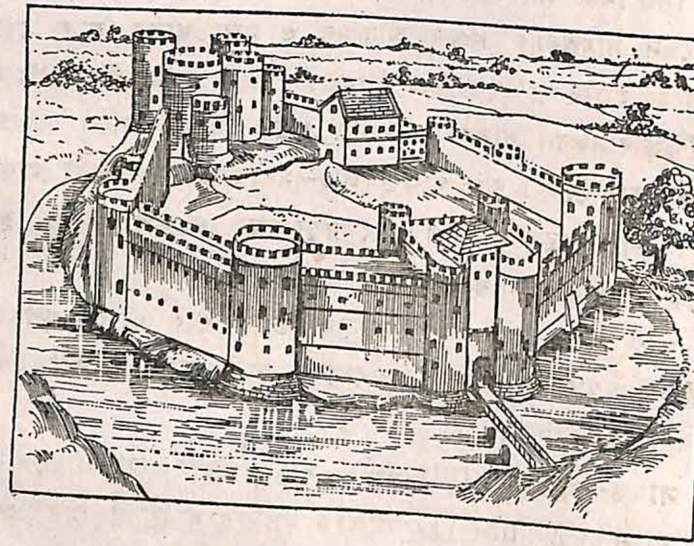
তাই সামন্ত-প্রভুদের সুরক্ষিত বাসভবন এবং এইসব লৌহবর্ম-পরিহিত অশ্বারোহী যোদ্ধার দল দেশের প্রতিরক্ষায় ও শান্তিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিত।

সামন্ত-প্রভুদের প্রাসাদ-দুর্গঃ সামন্ত-প্রভুদের জমিদারিকে বলা হ'ত **ম্যানর** (Manor)। প্রত্যেক ম্যানরে সামন্ত-প্রভুদের একটি ক'রে বাস-ভবন থাকত। তাকে বলা হ'ত ম্যানর-হাউস (Manor house)। ম্যানর-হাউসগুলি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। তাই এগুলিকে বলা হ'ত **ক্যাসল** (Castle) বা প্রাসাদ-দুর্গ।

প্রাসাদ-দুর্গগুলি সাধারণত পাহাড়ের ওপর বা উঁচু জায়গায় নির্মিত হত। প্রাসাদগুলি পাথরের তৈরি খুব জমকালো চেহারার হ'ত। চারদিক ঘেরা থাকত উঁচু প্রাচীরে। এইসব প্রাচীরের বাইরে থাকত গভীর সুপ্রশস্ত পরিখা। পরিখার ওপর থাকত সেতু। ঐ সেতুকে ইচ্ছামতো উঠানো-নামানো যেত। সেটাই প্রাসাদ-দুর্গ ও বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। শত্রুর আক্রমণকালে প্রাসাদ-দুর্গের ভেতর থেকে যেমন প্রতি-আক্রমণ করা চলত, তেমনি প্রাচীর ও পরিখা সহজেই শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করত।

প্রাসাদের ভেতরে থাকত কয়েকখানা শোবার ঘর ও মাঝখানে একটা বিরাট হল। জানালা-দরজাগুলি শত্রুর আক্রমণের ভয়ে খুব

বড় হ'ত না। সে-যুগে মশালই আলো যোগাতো। তাই প্রাসাদগুলির ভেতরে কিছুটা অন্ধকার ও থমথমে ভাব থাকত। শত্রুর আক্রমণ-কালে অনেক সময় প্রাসাদ-দুর্গগুলি প্রজাদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠত।



মধ্যযুগের প্রাসাদ-দুর্গ

লৌহবর্মাবৃত অশ্বারোহীর দল : নাইট সম্প্রদায় : হূন ও জার্মান আক্রমণকারীরা সকলেই দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী ছিল। তবে লৌহ-বর্মের ব্যবহার সম্ভবত গথরাই প্রথমে করে। পরে মধ্যযুগে শত্রুর ও দস্যুর আক্রমণ-প্রতিরোধে, অপরাধ-নিবারণে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় লৌহবর্মাবৃত অশ্বারোহীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পরে এ থেকেই নাইট সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। নাইটরা ছিল বীর যোদ্ধা এবং সামন্ত শ্রেণীর লোক।

এরা লোহার বর্ম প'রে ঘোড়ায় চড়ে তীর-ধনুক, তরবারি ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করত। এরা শত্রুর আক্রমণকালে যেমন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত ক'রে দেশরক্ষা করত, তেমনি দুর্বৃত্ত ও দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই ছিল এদের ব্রত। এরা দুর্বল ও বিপন্নকে রক্ষা করত। এরা নারী-

জাতির সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য প্রাণ দিত। নারী-জাতির প্রতি এদের সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রকাশ নারী-জাতিকে এক মহিমার আলোকে মণ্ডিত করেছিল। নাইটরা খ্রীষ্টধর্মের রক্ষার জন্যও প্রাণ দিত। ধর্মরক্ষার জন্য জীবনদান এদের বীরব্রতের প্রধান অঙ্গ ছিল।

সকলেই নাইট হ'তে পারত না। সামন্তবংশীয় তরুণরাই নাইট হ'ত। অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য মধ্যযুগের ইতিহাসে নাইটরা অমর হয়েছিলেন—গড়ে উঠেছিল নাইট সম্প্রদায়।

সাধারণত সামন্ত-প্রভুদের ছোট ছেলেরাই নাইট হ'ত। নাইট হ'তে ইচ্ছুক বালক সাত-আট বছর বয়স থেকে একজন সামন্ত-প্রভুর পরিবারে থেকে সেবা, সৌজন্য ও আদর্শ রীতি-নীতি শিখত। শিক্ষা শেষ হ'লে গির্জায় ধর্মযাজকদের পরিচালনায় আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে সে 'নাইট' উপাধি পেত।

তার আগে তাকে ধর্মযাজকের কাছে তার জীবনের সব গোপন পাপের কথা স্বীকার করতে হ'ত। ধর্মযাজক তাকে তার সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। তাকে এসব উপদেশ পালনের শপথ নিতে হ'ত। তারপর ধর্মযাজক একটি তরবারি মন্ত্রপূত ক'রে তার কাঁধে রেখে দিতেন। তখন সে তার সামন্ত-প্রভুর কাছে 'নাইট' উপাধি প্রার্থনা করত। সামন্ত-প্রভু তাকে বলতেন—"তুমি যদি সম্পদে, বিলাসে, আরামে দিন কাটাতে চাও, তবে তুমি এই সম্মানের অধিকারী নও।" তখন সে তার জীবন-আদর্শ ব্যক্ত করত এবং উপস্থিত নাইট ও মহিলারা তাকে বর্মে ও অস্ত্রে সজ্জিত ক'রে দিত। এর পর সামন্ত-প্রভু তার কাঁধে তরবারির ভোঁতা দিক দিয়ে আঘাত ক'রে বলতেন—"ঈশ্বরের নামে, সেণ্ট মাইকেলের নামে ও সেণ্ট জর্জের নামে আমি তোমাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করলাম।" তখন সে তার শিরস্ত্রাণ মাথায় প'রে এক লাফে ঘোড়ায় চ'ড়ে বর্শা বাগিয়ে সবেগে গির্জা থেকে বেরিয়ে যেত। তারপর সে তার অনুচরদের নানা উপহার দিত এবং বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়িত করত।

গোড়ার দিকে, অবশ্য কোন নাইট অন্য কাউকে অসমসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তার কাঁধে তরবারির ভোঁতা দিক দিয়ে আঘাত ক'রে তাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করতেন। পরে গির্জায় অনুষ্ঠান ক'রে নাইট উপাধি দানের ব্যবস্থা করা হয়।



মধ্যযুগীয় নাইট

নাইটরা ছিলেন মধ্যযুগের অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁরা যুদ্ধের সময়েও শত্রুর প্রতি কতকগুলি আচরণ-বিধি মেনে চলতেন। ক্রুসেডের সময়ে বহু নাইট যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। পরে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হ'লে নাইটদের যুগ শেষ হয়।

৪. সামন্ততান্ত্রিক যুগে জীবনযাত্রা

আঞ্চলিক ও সংকীর্ণ: সামন্ততান্ত্রিক যুগে জীবনযাত্রা রোমান যুগের জীবনযাত্রা ও আধুনিক কালের জীবনযাত্রা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। রোমান যুগে পথঘাট, যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ছিল প্রচুর; আধুনিক কালেও এসব সুযোগ প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু মধ্যযুগে পথঘাট ছিল না; যেসব পথঘাট ছিল, তা-ও নিরাপদ ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রায় লোপ পেয়েছিল। কৃষক শ্রেণীর লোকেরা ছিল ভূমিদাস। নিজ ভূমি ছেড়ে কোথাও যাওয়া তাদের পক্ষে ছিল দণ্ডনীয়। ফলে মানুষের জীবন নিতান্ত স্থানীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ না থাকায় মানুষের মন অত্যন্ত সংকীর্ণ, অনুদার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। জনসাধারণ তাদের সামন্ত-প্রভুকেই প্রভু মান করত। অনেকে দেশের রাজার নাম পর্যন্ত জানত না।

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবন: ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় শহরগুলি প্রায় লোপ পেয়েছিল। মানুষের জীবন গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামগুলি ছিল কৃষিনির্ভর। যারা পশুপালন বা কারিগরি কাজ করত, তাদের চাষ-আবাদ করতে হ'ত। ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় কারিগররা প্রয়োজনের বেশী কিছু উৎপন্ন করত না। কারণ, বেশি উৎপন্ন করলে তার ক্রেতা পাওয়া যেত না। ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় মানুষকে স্থানীয় উৎপাদনের ওপরই নির্ভর করতে হ'ত। তাই জীবনযাত্রার মান ছিল অনুন্নত।

ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় সমাজে মুদ্রার ব্যবহার প্রায় ছিল না। সাধারণ মানুষ নিজের প্রয়োজন বিনিময়ের মাধ্যমে মেটাত। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, সামন্ত-প্রভুদের হাতেও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ থাকত না। সামন্ত-প্রভুরা বিত্তশালী হ'লেও অর্থশালী ছিলেন না।

জনসাধারণের জীবন-যাপনের মান অত্যন্ত নিচু হওয়ায় সর্বত্রই ছিল একটা দারিদ্র্যের ছাপ। মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। সামন্ত-প্রভুদের জীবনেও বিলাস-ব্যসনের ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য ছিল না। তা সত্ত্বেও যেটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তা তাঁরাই ভোগ করতেন।

শিভাল্‌রি: সামন্ততান্ত্রিক যুগের জীবন-যাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল শিভাল্‌রি। 'শিভাল্‌রি' শব্দের কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নেই। শিভাল্‌রি শব্দের মূল অর্থ 'অশ্বারোহী-বাহিনী'। নাইটরাই ছিল অশ্বারোহী যোদ্ধা। সত্যপালন এবং দুর্বল, বিপন্ন ও নারীর রক্ষার জন্য বীরত্ব প্রকাশ ছিল নাইটদের অবশ্যকরণীয় কাজ। তাই সত্যপালন এবং দুর্বল, বিপন্ন ও নারীর রক্ষায় বীরত্ব প্রদর্শন এবং নারীর প্রতি সম্ভ্রম ও সৌজন্য প্রকাশ 'শিভাল্‌রি' নামে পরিচিত। এই শিভাল্‌রির ভিত্তিতেই নাইট-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল।

চারণ কবি বা ত্রুবেদর: শিভাল্‌রি ও নাইটদের গৌরবময় কীর্তিকলাপ বহু কাহিনী ও কিংবদন্তীর বিষয় হয়েছিল। নাইটরাও

নিজেদের জীবনকে বিখ্যাত বীরদের জীবনের আদর্শে গ'ড়ে তুলতেন। তাই তাঁদের গৌরবময় কাহিনীও ছিল খুবই জনপ্রিয়।

ফ্রান্সে এই বীরত্ব-কাহিনী শাঁসঁ দ্য জেস্ত, বা বীরত্ব-কাহিনী নামে প্রচলিত ছিল। সম্রাট শার্লেমানের ভ্রাতুষ্পুত্র রোলাঁ স্পেনে আরবদের সঙ্গে এক যুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিয়েছিলন। রোলাঁর এই বীরত্ব-কাহিনী খুবই জনপ্রিয় ছিল। ইংলণ্ডের রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদের বীরত্ব-কাহিনীও সুপ্রচলিত ছিল। জার্মানিতে পার্সিভ্যাল, ট্রিস্টান, সিগ্‌ফ্রীড প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনীও খুবই জনপ্রিয় ছিল। এইসব কাহিনী ও বীরগাথা গেয়ে চারণ কবিরা ঘুরে বেড়াতেন। এঁরা ফ্রান্সে ত্রুবেদর ও জার্মানিতে মিনেসিংগার নামে পরিচিত ছিলেন।

এই ধরনের বীরগাথা রচনার সূত্রপাত হয় ফ্রান্সের প্রোভেন্স অঞ্চলে। আগে কবিতা ও গান রচিত হ'ত ল্যাটিন ভাষায়। এখন স্থানীয় কথ্য ভাষাগুলিতেই সেগুলি রচিত হ'তে লাগল। এইভাবে ইউরোপে আধুনিক ভাষাগুলির বিকাশ শুরু হ'ল।

এইসব চারণ কবিরাও ছিলেন সামন্তশ্রেণীর লোক। তাঁরা সামন্তদের প্রাসাদে প্রাসাদে ঘুরে বেড়িয়ে এইসব বীরগাথা ও গান শোনাতেন। রাজারাও অনেক সময় ত্রুবেদর হতেন। ইংলণ্ডের রাজা সিংহহৃদয় রিচার্ড একজন বিখ্যাত ত্রুবেদর ছিলেন।

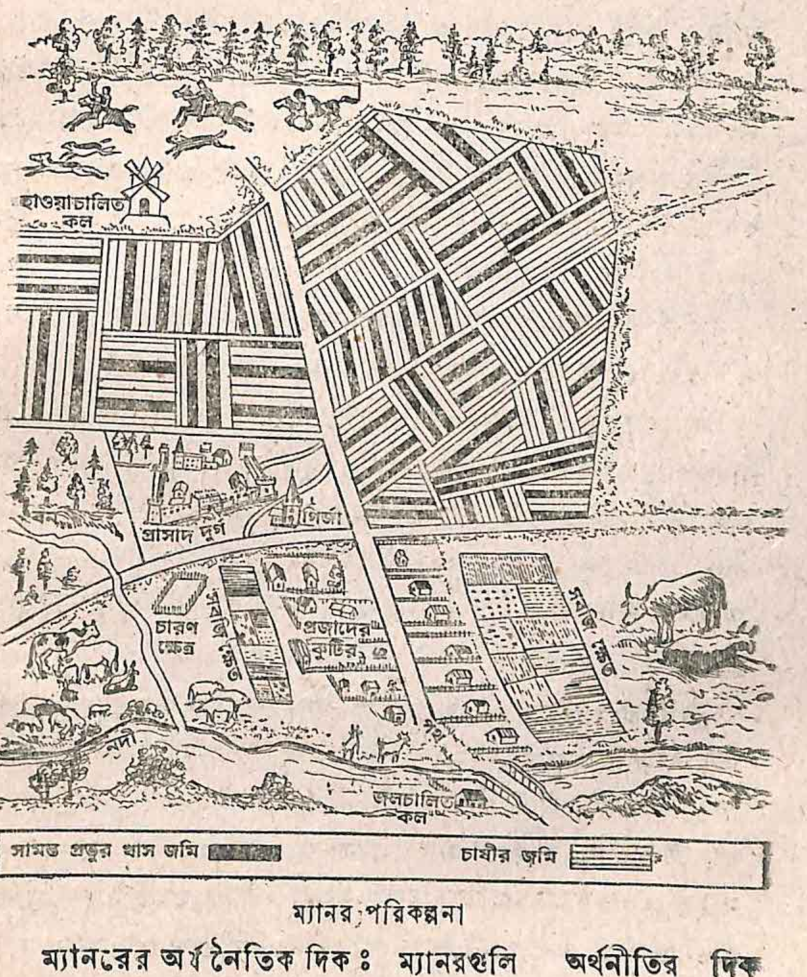
৫. ম্যানরীয় ব্যবস্থা

ম্যানর পরিকল্পনা : সামন্ত-প্রভুদের ভূসম্পত্তি বহু ম্যানরে বিভক্ত থাকত। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত এক-একটি ম্যানর। ম্যানরের মাঝখানে থাকত সামন্ত-প্রভুর বাসভবন বা ম্যানর-হাউস। ম্যানর-হাউসের অদূরে থাকত গির্জা। সেখানে ম্যানরের ধর্মযাজক থাকতেন, ম্যানরের লোকেরা সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিত। গির্জার মাঠে তারা আমোদ-প্রমোদের জন্য জড়ো হ'ত।

ম্যানর-হাউসের কাছে থাকত সামন্ত-প্রভুর খাস-জমি। তার

চারদিকে থাকত কৃষক বা ভূমিদাসদের জমি, পথঘাট, পশুচারণক্ষেত্র, শিকারের জন্য রক্ষিত বন আর কৃষক ভূমিদাসদের কুটির।

সামন্ত-প্রভুর খাস জমি বাদে অন্য সব জমি ফালি ফালি ক'রে কৃষক বা ভূমিদাসদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ত। কৃষক বা ভূমিদাসরা তাদের নিজ নিজ জমি চাষ করত আর সামন্ত-প্রভুর জমি চাষ ক'রে দিত বাধ্য থাকত।



ম্যানর পরিকল্পনা

ম্যানরের অর্থনৈতিক দিক: ম্যানরগুলি অর্থনীতির দিক থেকে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। নুন, লোহা, কিছু কিছু মশলা প্রভৃতি ছাড়া প্রায় অন্যান্য সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ম্যানরেই

উৎপন্ন হ'ত। খাদ্যশস্য, সবজি, ফল, দুধ, মাখন, মাংস, ডিম প্রভৃতি ম্যানরগুলিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'ত। আসবাব-পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র ও কৃষির যন্ত্রপাতি, সবই ম্যানরে তৈরি হ'ত। পোশাক ও পোশাকের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় ও চামড়াও ম্যানরগুলিতে প্রস্তুত হ'ত। এসব কাজের জন্য পৃথক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকত না। ঐসব কাজের সঙ্গে সকলকেই কৃষিকার্য করতে হ'ত। ম্যানরে শিল্পী ও কারিগররাও ছিল কৃষক ও ভূমিদাস।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ না থাকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করা লাভজনক ছিল না। তাই ম্যানরীয় ব্যবস্থায় উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। শিল্পী-কারিগরদেরও চাষ করতে হ'ত, সেজন্য শিল্পী ও কারিগরদের দক্ষতার দিক থেকে বিশেষ উন্নতি করা সহজ ছিল না।

তাই ম্যানরীয় ব্যবস্থায় উদ্‌বৃত্ত সম্পদ্-সৃজনের প্রতি নজর দেওয়া হ'ত না। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল।

সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্থানীয় একক : ম্যানরগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার স্থানীয় ক্ষুদ্রতম অংশ বা একক বলা চলে। সামন্ত-প্রভুদের হুকুমই ম্যানরে আইন ব'লে গণ্য হ'ত। ম্যানরের সকল অপরাধ ও অভিযোগের বিচারও ম্যানরে সামন্ত-প্রভুদের কাছারিতে হ'ত। ম্যানরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাও করতেন সামন্ত-প্রভুরা।

ম্যানর-হাউসের জীবনযাত্রা : ম্যানর-হাউসে সামন্ত-প্রভু এবং তাঁর পরিবার বাস করতেন। সেই সঙ্গে থাকত পরিবারের লোকজন, ঝি-চাকর, কর্মচারী ও পাইক-পেয়াদার দল। ম্যানরগুলিতে শৌখিন বস্তু উৎপন্ন না হওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত না থাকায় সামন্ত-প্রভুদের জীবনযাত্রাও যথেষ্ট সরল ও অনাড়ম্বর হ'ত। ম্যানর হাউসগুলিতে খাদ্য-পানীয়ের প্রাচুর্য ছিল। খাদ্য-ভাণ্ডার সর্বদা সাদা আটার রুটি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাখন, পনির, বাঁধাকপি, গাজর, পেঁয়াজ, শশা প্রভৃতি সবজি এবং আঙুর, আপেল, চেরি

প্রভৃতি ফলে পূর্ণ থাকত। ষাঁড়, শুয়োর, হরিণ এবং নানারকম পাখি প্রায়ই আস্ত রান্না করা হ'ত। ছুরি-কাঁটার ব্যবহার তখনো প্রচলিত হয়নি, আঙুল ও কাঠের চামচের সাহায্যে খাওয়া হ'ত।

সামন্তদের পোশাক-পরিচ্ছদও শৌখিন ছিল না। তাঁরা পশমের ও চামড়ার পোশাক ব্যবহার করতেন।

সাধারণত সামন্ত-প্রভুদের বাসভবনের কক্ষগুলিতে আসবাবপত্র বেশি থাকত না। তবে অনেক সময় ঐসব আসবাবপত্র তাঁদের সুরুচির পরিচয় দিত। বাসভবনের কক্ষের দেওয়ালগুলি অনেক সময় নক্সা-করা সুন্দর পর্দায় ঢাকা থাকত।

সামন্তদের প্রাসাদে অনেক সময় উৎসবের আয়োজন হ'ত। তাতে ভোজ, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকত। ত্রুবেদররা এসে বীরত্ব-গাথা শোনাতেন। হাস্য-কৌতুক চলত। অনেক সময় কুস্তি ও নানারকম অস্ত্রচালনার প্রতিযোগিতা হ'ত। অস্ত্রচালনা-শিক্ষা ও অনুশীলন একাধারে আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ও প্রয়োজনীয় কর্ম ছিল। সামন্তদের প্রধান প্রমোদ ছিল শিকার। তাঁরা প্রায়ই লোকজন নিয়ে শিকারে যেতেন এবং বনগুলি তোলপাড় করতেন।

সামন্ত-প্রভুদের একাধিক ম্যানর থাকত। একটি ম্যানরে খাদ্য-পানীয় ফুরিয়ে গেলে তাঁরা সপরিবারে অন্য ম্যানরে চলে যেতেন।

৬. কৃষি-ব্যবস্থা : সম্ভ্রান্ত, যাজক ও জনসাধারণ

কৃষির গুরুত্ব : সামন্ততান্ত্রিক সমাজে দেশের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। দেশে কারিগরি ও শিল্প সামান্যই ছিল। যারা ম্যানরে প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম বা কারিগরি করত, তাদেরও চাষ-আবাদ করতে হ'ত। কৃষকরাই পশুপালন করত। ব্যবসা-বাণিজ্য বলে প্রায় কিছুই ছিল না। তাই বলা চলে, সম্ভ্রান্ত ও যাজক শ্রেণী ছাড়া প্রায় সকলেই ছিল কৃষক।

কৃষকদের অবস্থা : দেশে স্বাধীন কৃষক অল্পই ছিল। সাধারণ মানুষেরা প্রায় সকলেই ছিল ভূমিদাস। কৃষকদের উদয়াস্ত পরিশ্রম

করতে হ'ত। জমিদার ও গির্জা তাদের নানাভাবে শোষণ করত। তাদের দুর্বহ করের বোঝা বইতে হ'ত। তাদের জীবন অভাব-অনটন ও দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে কাটত। নানা কারণে নানা সময়ে তাদের জমিদার ও গির্জাকে অর্থ দিতে হ'ত। তাদের অনেক সময় অন্যায়ভাবে অর্থদণ্ড করা হ'ত। তারা পুরুষানুক্রমে অভাব-অনটন, অত্যাচার-লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করত। তারা এটাকেই ভগবানের বিধান বা ভাগ্যলিপি ব'লে মেনে নিত।

সমাজে তিন শ্রেণী ঃ সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— সম্ভ্রান্ত, যাজক ও জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক। সমাজের সবার ঊর্ধ্বে ছিলেন সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এবং সর্বনিম্নে ছিল জনসাধারণ। জনসাধারণ ছিল সম্ভ্রান্তদের ঠিক বিপরীত। সম্ভ্রান্তদের জীবন যেমন প্রাচুর্যে পূর্ণ ছিল, জনসাধারণের জীবন ছিল তেমনি দুঃখ-দৈন্যে ভরা।

যাজক শ্রেণী ঃ গির্জাও প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল। চার্চ বা গির্জা নানাভাবেই জমির মালিক হ'ত। অনেকে ঈশ্বরকে তুষ্ট রাখার জন্য বা পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে চার্চকে জমি দিত। রাজা ও সামন্ত-প্রভুরাও চার্চকে প্রচুর জমি দিতেন। চার্চ নানা জনহিতকর কাজ করত, সেজন্যও অনেকে চার্চকে জমি দিত। এইভাবে চার্চগুলি বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। তারা ভূমিদাসদের জমিতে খাটাত। ভূমিদাসদের সঙ্গে তাদের ছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। যাজকরা নানাভাবেই কৃষকদের শোষণ করত, তাদের উপর নানাভাবে অবিচার অত্যাচার চালাত। চার্চ ম্যানরের সকল অধিবাসীর কাছ থেকেই অর্থ আদায় করত।

ফলে যাজকদের অবস্থাও যথেষ্ট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ ছিল। তাঁদের অনেকে সম্ভ্রান্তদের মতোই বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকতেন।

সামন্ত-প্রথা যেমন সারাদেশে ব্যাপ্ত ছিল, তেমনি ধর্মযাজকদের ক্ষমতাও সারাদেশে ব্যাপ্ত ছিল। ঐসময়ে ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক ধর্মই সুপ্রচলিত ছিল। রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রধান ছিলেন পোপ। তাঁর বাসস্থান ও প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল

রোম। ইউরোপে অনেক ছোট বড় স্বাধীন রাজ্য ছিল, কিন্তু পোপের শাসন ছিল সারা খ্রীষ্টান ইউরোপে। তাঁর ধর্মীয় অনুশাসন রাজা ও সম্রাট সকলকে মেনে চলতে হ'ত

সারা ইউরোপে ধর্মীয় শাসন সুদৃঢ় রাখার জন্য ইউরোপের খ্রীষ্টান অঞ্চলগুলিকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতি প্রদেশের প্রধান যাজককে বলা হ'ত আর্চবিশপ। প্রদেশগুলি আবার বিভক্ত থাকত কতকগুলি ডায়োসেসে বা জেলায়। ডায়োসেসের প্রধান যাজক ছিলেন বিশপ। ডায়োসেসগুলি বিভক্ত ছিল কতকগুলি প্যারিসে। প্যারিসের যাজককে বলা হ'ত প্রীস্ট। খ্রীষ্টান চার্চের এই সংঘবদ্ধ সংগঠন যাজকশ্রেণীকে অতিশয় ক্ষমতাশালী ক'রে তুলেছিল।

৭. ভূমিদাস-প্রথা—ভূমিদাসদের অবস্থা

ভূমিদাস-প্রথার উদ্ভব ঃ এই সমাজ-ব্যবস্থায় সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা ছিল ভূমিদাসদের। ভূমিদাসদের বলা হয় সার্ফ বা ভিলিন।

রোমান যুগে ক্রীতদাসদের দিয়েই কৃষি, শিল্প ও গৃহকর্ম করানো হ'ত। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ক্রীতদাসদের দিয়ে কাজ করানো লাভজনক ছিল না, তাদের ভরণপোষণও জমিদারদের পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। তাই তখন জমির মালিকরা ক্রীতদাসদের মধ্যে এক এক টুকরো জমি চাষের জন্য বিলি ক'রে দেন। এইভাবেই ভূমিদাস-প্রথার সূচনা হয়। স্বাধীন কৃষকরাও অনেকে শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য সামন্ত-প্রভুদের শরণাপন্ন হয় এবং ভূমিদাস হয়ে পড়ে।

ভূমিদাসদের শোচনীয় অবস্থা ঃ ক্রীতদাসদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল মালিকের। কিন্তু নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হ'ত ভূমিদাসকে নিজেকে। কেবল তাই নয়, ভূমিদাসকে মালিকের জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে চাষ-আবাদ ক'রে দিতে হ'ত, মালিকের বাড়ির কাজ-কর্ম ও অন্যান্য কাজও তাকে

করতে হ'ত, নানা ফাই-ফরমাস খাটতে হ'ত। জমি ছেড়ে ভূমিদাস কোথাও যেতে পারত না ; মালিকের জমি হস্তান্তরিত হ'লে জমির সঙ্গে ভূমিদাস-ও হস্তান্তরিত হ'ত।

মালিকের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে খেটেই সে রেহাই পেত না। তাকে মালিককে নানারকম কর দিতে হ'ত। ভূমিদাস মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী জমিদারকে কর দিয়েই উত্তরাধিকার পেত। ভূমিদাসকে পয়সা দিয়ে মালিকের যাঁতাকলে গম কুটোতে হ'ত, মালিকের চুল্লিতে রুটি সেঁকতে হ'ত। মালিকের মাড়াই-কলে আঙুর পিষে মদ বানাতে হ'ত। মালিকের আদালতে তার বিচার হ'ত। সামান্য অপরাধের জন্য তাকে কড়া জরিমানা দিতে বা কঠোর শাস্তিভোগ করতে হ'ত।

ছোট ছোট কুঁড়েঘরে তারা থাকত। শীতে, বৃষ্টিতে ভয়ানক কষ্ট পেত। তাদের ঘরদোর ও পোশাক খুব নোংরা থাকত। তারা অনেক সময় পেট ভরে খেতেও পেত না। মোটা আটার লাল রুটি, কিছু শাক-সবজি, নিকৃষ্ট মাংস ও পচাই মদ তারা খেত। ভালো খাদ্য-পানীয় খাওয়া তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। শীত নিবারণের জন্যে চামড়ার সাধারণ পোশাক তারা পরত, মোটা পশমের পোশাকও কেউ কেউ পরত। তাদের সম্পত্তির মধ্যে থাকত কয়েকটা গোরু, শুয়োর বা একটা ঘোড়া। তারা ছিল মূর্খ, নিরক্ষর ও নির্বোধ।

তারা পশুর মতোই জীবন কাটাত। মালিকরাও তাদের গোরু-বলদের চেয়ে উচ্চস্তরের জীব মনে করত না। জমি বিক্রির সময়ে সেই জমির সঙ্গে ভূমিদাসদেরও দাম ধরা হ'ত। অনেক সময় ভূমিদাসদের দাম ঘোড়া-বলদের দামের চেয়েও কম ধরা হ'ত। ভূমিদাসদের ছেলেরাও ভূমিদাস হ'ত। ভূমিদাসদের পরিবার ও মেয়েদেরও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হ'ত।

তাদের জীবন ছিল একান্ত একঘেঁয়ে, আমোদ-প্রমোদ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে তারা গির্জার মাঠে জড়ো

হয়ে কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি করত, সামন্ত-প্রভুদের অস্ত্র-প্রতিযোগিতা দেখত, নিজেদের মধ্যে কুস্তি প্রভৃতির প্রতিযোগিতা করত। উৎসবের দিনে গির্জার মাঠে নাচ-গান হৈ-হল্লা করত।

ভূমিদাসদের মুক্তির উপায়ঃ এই দাসত্ব-বন্ধনকে তারা বিধির বিধান ব'লে মেনে নিত। তবে সকলেই যে এই দাসত্ব-বন্ধনকে শান্তচিত্তে মেনে নিত, তা নয়। জমি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে ধরা পড়লে তাদের কঠোর শস্তি হ'ত। তবু তারা সুযোগ পেলেই জমি ছেড়ে পালাত। তারা অনেক সময় সন্ন্যাসী হয়ে ভূমিদাসত্ব এড়াত, অনেক সময় শহরে পালিয়ে গিয়ে কলকারখানার কাজে যোগ দিত বা ব্যবসা-বাণিজ্যে লেগে যেত।

অনেক সময় তারা দলবদ্ধভাবে মালিকের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। এইসব বিদ্রোহ অনেক সময় ব্যাপক আকার ধারণ করত। মধ্যযুগে এইরূপ বহু কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল। এইসব বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করা হ'লেও এর ফলে মালিকরা কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হ'ত।

ভূমিদাসত্ব লোপের কারণঃ ক্রুসেড ও অনেকগুলি মহামারীর ফলে দেশে কৃষকের অভাব হ'লে মালিকরা এদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়। দেশে কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে বেড়ে ওঠায় শ্রমিক ও কুলিমজুরের প্রয়োজন ক্রমেই বাড়ছিল। তাই কলকারখানার মালিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী ভূমিদাসদের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তির সমর্থক হয়েছিল। দেশে কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শহরগুলির বিকাশের ফলে ভূমিদাস-প্রথা ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল।

অনুশীলনী

১। 'ফিউড্যালিজ্‌ম্' বা সামন্ততন্ত্র কথার অর্থ কি? ইউরোপে ফিউড্যালিজ্‌ম্ বা সামন্ততন্ত্র কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

২। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভূমি-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

৩। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে লর্ড ও ভ্যাসাল বলতে কি বোঝাত? লর্ডের সঙ্গে ভ্যাসালের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৪। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্তদের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে যা জান লিখ।
৫। মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রাসাদ-দুর্গগুলির গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৬। মধ্যযুগীয় ইউরোপে লোহবর্মাবৃত অশ্বারোহীর ভূমিকা কি ছিল?
৭। 'নাইট' সম্প্রদায় বলতে কি বোঝ? তারা কিভাবে নাইট হ'ত?
৮। 'নাইট' হওয়ার অনুষ্ঠান বর্ণনা কর।
৯। 'শিভাল্‌রির' অর্থ কি? মধ্যযুগে 'শিভাল্‌রির' গুরুত্ব কিরূপ ছিল?
১০। মধ্যযুগীয় সমাজে সামন্তদের প্রভুত্ব বর্ণনা কর।
১১। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?
১২। ম্যানরীয় ব্যবস্থা কি? ঐ ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।
১৩। ম্যানর্-হাউসে সামন্ত-প্রভুদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।
১৪। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কয়টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? ঐ সমাজের শীর্ষে ও সর্বনিম্নে কারা ছিল?
১৫। মধ্যযুগের যাজক শ্রেণী সম্পর্কে যা জান লিখ।
১৬। ভূমিদাস-প্রথার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল?
১৭। ভূমিদাসদের জীবন সম্পর্কে যা জান লিখ।
১৮। ভূমিদাসরা কিভাবে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করত? ভূমিদাসত্ব কিভাবে লোপ পেয়েছিল?
১৯। টীকা লিখ: নাইট, ক্রবেদর, ম্যানর, ম্যানর-হাউস।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। লর্ড ও ভ্যাসাল শব্দের অর্থ কি?
২। 'ফিউড' কাকে বলে?
৩। ফিউড্যালিজ্‌ম্‌-এর বাংলা প্রতিশব্দ কি?
৪। ম্যানর কি?
৫। ম্যানর-হাউস কাকে বলে?
৬। ভূমিদাস কাদের বলা হয়?
৭। সার্ফ ও ভিলিন কাদের বলা হয়?
৮। ক্রবেদর বলতে কাদের বোঝায়?
৯। ইংলণ্ডের কোন্‌ রাজা ক্রবেদর ছিলেন?
১০। সর্বোচ্চ স্তরের সামন্ত কাদের বলা হয়?

ক্রুসেড বা ক্রুশের যুদ্ধ

১. ক্রুসেডের কারণসমূহ

ক্রুসেড কি : মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় দুই শতাব্দী কালেরও বেশি সময় খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে খ্রীষ্টান যোদ্ধারা ক্রুশ-চিহ্ন ব্যবহার করত। তাই এই যুদ্ধ ক্রুশের যুদ্ধ বা ক্রুসেড নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পশ্চাতে কতকগুলি কারণ ছিল।

সেলজুক তুর্কীদের অধিকার-বিস্তার : মধ্য-এশিয়ায় আলটাই পর্বতমালা ও গোবি মরুভূমির উত্তরে ছিল তুর্কীদের আদি-বাসস্থান। আরবরা যখন মধ্য-এশিয়ায় তাদের অধিকার বিস্তার করেছিল, তখন তুর্কীরা তাদের পদানত হয়। তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরে সেলজুক নামে এক নেতার নেতৃত্বে তুর্কীরা খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অধিকার বিস্তার করে। সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করায় ইসলাম সম্পর্কে তারা অত্যুৎসাহী ছিল।

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কে পরিবর্তন : হজরত মহম্মদ খ্রীষ্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের অনেক সাদৃশ্য থাকায় তা গোড়ার দিকে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। তাই ধর্মের ব্যাপারে খৃষ্টান ও মুসলমানরা পরস্পর সহিষ্ণু ছিল। ফলে, ইউরোপের খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা মুসলিম-অধিকৃত এশিয়ায় অবাধে তীর্থযাত্রা করত এবং মুসলমান-অধিকৃত অঞ্চলের খ্রীষ্টান প্রজাদের ওপর মুসলিম শাসকরা অত্যাচার করত না। কিন্তু সেলজুক তুর্কীরা ছিল ধর্মান্ধ; তাদের অধিকার-বিস্তার খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্কে পরিবর্তন ঘটাল।

সেলজুক তুর্কীরা বাগদাদের খলিফাকে ক্রীড়নকে পরিণত করেছিল। তারা পারস্য, আর্মেনিয়া এবং পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের

বহু অঞ্চল অধিকার করেছিল। ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যান্‌জিকার্টের যুদ্ধে বাইজান্‌টাইন সম্রাট তাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে খ্রীষ্টান ইউরোপ যে বিপন্ন হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। নববিজিত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কীরা খ্রীষ্টান প্রজা ও তীর্থযাত্রীদের ওপর যে অত্যাচার শুরু করেছিল, তার অতিরঞ্জিত কাহিনীও ইউরোপে পৌঁছেছিল এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের সম্পর্ক খুবই তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টা : ঐ সময়ে ইউরোপে রোমান ক্যাথলিক চার্চেরই ছিল প্রভুত্ব। কিন্তু বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্য রোমান চার্চের প্রভুত্ব স্বীকার করত না। সেখানে প্রভুত্ব করত গ্রীক চার্চ। তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বাইজান্‌টাইন সম্রাট তুর্কীদের আক্রমণে খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন এই কারণ দেখিয়ে রোমান চার্চের সাহায্য চাইলেন। পোপ দ্বিতীয় আরবান এ-কে বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্যে রোমান চার্চের প্রভাব বিস্তারের প্রকৃষ্ট সুযোগ ব'লে মনে করলেন।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ : জার্মান উপজাতিসমূহ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে রাজ্যস্থাপন করেছিল। এরা সকলে অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয় হওয়ায় সর্বদা আত্মকলহে লিপ্ত ছিল। তাতে ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিল। এরা সকলেই ছিল খ্রীষ্টান। তাই এদের আত্মকলহ ত্যাগ করিয়ে যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে যুদ্ধে নিয়োজিত করা যায়, তবে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হবে ভেবে পোপ এদের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করছিলেন। এতে ইউরোপে পোপের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাবে, এমন আশাও ছিল।

সামন্তদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় ভূসম্পত্তির সমস্যাও তীব্র হয়ে উঠেছিল। তুর্কী অধিকৃত এশীয় অঞ্চল জয় করলে সেখানে সামন্তদের ভূসম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা আছে, এমনও বোঝানো হয়েছিল।

দেশের সাধারণ মানুষেরও দৈন্য-দুর্দশার সীমা ছিল না। তাদেরও বোঝানো হয়েছিল, ঐসব এশীয় অঞ্চল জয় করতে পারলে তারাও ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

২. ক্রুসেডের প্রধান প্রধান ঘটনা

পোপের আহ্বান : বাইজান্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস ১০৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পর বৎসর দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্লেরমণ্টে এক সভায় পোপ দ্বিতীয় আরবান যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি মুসলিম-অধিকৃত পশ্চিম এশিয়ায় খ্রীষ্টান অধিবাসী ও তীর্থযাত্রীদের ওপর অত্যাচারের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মস্থান জেরুজালেম ছিল খ্রীষ্টানদের পবিত্রতম তীর্থ। এখানে ছিল যীশুখ্রীষ্টের সমাধি-মন্দির। জেরুজালেম বিগত চার শ বছর ধরে ইসলামের অধিকারে ছিল। কিন্তু আরবরা খ্রীষ্টানদের তীর্থযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেনি। সেলজুক তুর্কীরা তাতে বাধা সৃষ্টি করেছে, এই কারণ দেখিয়ে পোপ দ্বিতীয় আরবান খ্রীষ্টানদের জেরুজালেম উদ্ধারের আহ্বান জানালেন। তিনি একথাও বললেন যে, প্রাচ্য ধন-সম্পদে পূর্ণ, ঐ অঞ্চল উদ্ধার করতে পারলে প্রচুর ধন-সম্পদ্ ও ভূসম্পত্তি ইউরোপীয়দের হাতে আসবে।

পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্ভ্রান্তরা ধর্ম-যুদ্ধের শপথ নিলেন এবং পর বৎসর যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

প্রথম ক্রুসেড : ক্রুসেড যুদ্ধের ব্যাপার। তাই পোপ সম্ভ্রান্তদের কাছেই আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই আবেদন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগালো। সন্ন্যাসী পিটার, কপর্দকহীন ওয়াল্টারের মতো ব্যক্তিরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত ক'রে তুললেন। ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ধর্মযুদ্ধযাত্রার কথা ছিল। কিন্তু তার বহুপূর্বেই অসংখ্য দরিদ্র মানুষ সপরিবারে পথের দূরত্ব ও বিপদের কথা চিন্তা না

ক'রে প্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা হ'ল। দলে দলে রাইন নদী পার হয়ে হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করল, পথে বহু ইহুদীকে হত্যা করল, স্থানীয় অধিবাসীদের ধন-সম্পদ্ লুণ্ঠন ক'রে ত্রাসের সৃষ্টি করল। স্থানীয় অধিবাসীরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের হত্যা করল। বহুলোক খাদ্যাভাবে ও পথশ্রমে মারা গেল। মাত্র দুটি দল ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কন্স্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছল। সম্রাট আলেক্সিয়াস চেয়েছিলেন সামরিক সাহায্য। তাই এদের তিনি তাড়াতাড়ি জাহাজে ক'রে এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তারা তুর্কীদের হাতে নিহত হ'ল।

১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ও ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রকৃত যোদ্ধার দল কন্স্টান্টিনোপলে এসে পৌঁছল। সম্রাটের সাহায্যে ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তারা সমুদ্র-পথে এশিয়া মাইনরে গিয়ে পৌঁছল। এবং কঠোর সংগ্রামের পর এশিয়া মাইনর ও সিরিয়ার সুবিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করল। তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে অসংখ্য ধর্মযোদ্ধা নিহত হয়। অনেকে যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে দেশে ফিরে যায়। ধর্মযোদ্ধাদের নেতারা এক-একটি বিজিত অঞ্চলে এক-একটি সামন্তরাজ্য স্থাপন ক'রে ধর্মযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ান। এ নিয়েও ধর্মযোদ্ধাদের মধ্যে বিবাদ বাধে। তা সত্ত্বেও ধর্মযোদ্ধারা ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র নগর জেরুজালেমে গিয়ে পৌঁছে এবং জেরুজালেম অধিকার করে। এখানে তারা নির্বিচারে মুসলমানদের হত্যা করে। রক্তস্রোতে ধর্মযোদ্ধাদের ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায় ব'লে ধর্মযোদ্ধাদের একজন নেতা পোপকে সগর্বে লিখে জানান। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে খ্রীষ্টান আধিপত্য স্থাপিত হয়। জেরুজালেম, এন্টিওক, এডেসা প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি খ্রীষ্টান সামন্তরাজ্য স্থাপিত হয়।

১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের হাতে ছিল। এই অষ্টাশি বছরে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের জলপথে যোগাযোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ভূমধ্যসাগরের ওপর খ্রীষ্টানদের

আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখন দক্ষিণ ইউরোপের নগর ও বন্দরগুলি নৌশক্তিতে বলীয়ান ও নৌবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

তৃতীয় ক্রুসেড ঃ কিন্তু তুর্কীদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের যুদ্ধ শেষ হয় না। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুশ বছরে ষাট বার ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল। সেলজুক তুর্কীরা আরবদের পরাজিত ক'রে মিশর অধিকার ক'রে নিয়েছিল। মিশরের তুর্কী সুলতান সালাউদ্দিন বা সালাদিন ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার ক'রে নিলে সারা ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এইভাবে শুরু হয় তৃতীয় ক্রুসেড। এটাই সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রুসেড। পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের জার্মান সম্রাট ফ্রেডেরিক বারবারোসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড এই যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন। সম্রাট ফ্রেডেরিক বারবারোসা পথে ভয়ংকর বিপদে পড়েন এবং জলে ডুবে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক রিচার্ড ও তেইশ বৎসর বয়স্ক ফিলিপ পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হন। কিন্তু রিচার্ড ও ফিলিপের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। ফিলিপ অসুস্থতার অজুহাতে ধর্মযুদ্ধ ত্যাগ ক'রে স্বদেশে ফিরে যান। রিচার্ড একাই যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও অসুস্থ ছিলেন। তবু তাঁর উদ্যম ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি তাঁকে দুর্জয় ক'রে তোলে। এজন্য তিনি জনসাধারণের কাছে **সিংহ-হৃদয়** উপাধি পেয়েছিলেন।



তুর্কী সুলতান সালাদিন

তুর্কী সুলতান সালাউদ্দিন কেবল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহানুভব ও গুণগ্রাহী। তিনি রিচর্ডের বীরত্বে মুগ্ধ হন। তিনি একবার পরাজিত অসুস্থ রিচার্ডের চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেন। সালাউদ্দিনের বীরত্বে ও চরিত্রে রিচার্ডও মুগ্ধ হন।

ফলে ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সালাউদ্দিন ও রিচার্ডের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে লেভান্ট উপকূলের একাংশ খ্রীষ্টানদের অধিকারে থাকে এবং জেরুজালেমে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা নির্বিঘ্নে প্রবেশের অধিকার পায়।

চতুর্থ ক্রুসেড ঃ এই ক্রুসেড প্রকৃতপক্ষে তুর্কীদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের যুদ্ধ ছিল না। এই ক্রুসেড খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ক্রুসেডগুলির ফলে ইউরোপে পোপের অসামান্য শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। ইউরোপের সমস্ত শাসকই তাঁর আজ্ঞাবহে পরিণত হয়েছিল। ঐসময়ে পোপ ছিলেন তৃতীয় ইনোসেন্ট। তিনি হঠাৎ ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। ভেনিসীয়রা ধর্মযোদ্ধাদের সঙ্গে এই চুক্তি করল যে, তারা যদি ৮৫০০০ মার্ক দেয়, তবে তাদের ভেনিসীয়রা জাহাজে ক'রে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবে। প্রত্যেক ধর্মযোদ্ধার জন্য ২ মার্ক ও ঘোড়ার জন্য ৪ মার্ক নির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ধর্মযোদ্ধারা যখন এসে পৌঁছল, তখন দেখা গেল তাদের সংখ্যা কম, তাদের ভাড়া বাবদ ৫১০০০ মার্ক হচ্ছে। ভেনিসীয়রা তখন এই শর্ত দিল যে, ধর্মযোদ্ধারা যদি নৌবাণিজ্যে ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী জারা নগর অধিকার ক'রে ভেনিসকে দেয়, তবে তারা তাদের পৌঁছে দিতে পারে। ধর্মযোদ্ধারা রাজী হয়ে গেল। জারা ছিল খ্রীষ্টান শহর, হাঙ্গেরির খ্রীষ্টান রাজার অধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মযোদ্ধারা জারা অধিকার ক'রে ভেনিসকে দিল। পোপ ভেনিসকে ধর্মচ্যুত করলেও তারা তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না। কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে ভেনিসের লাভজনক বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ঐ বাণিজ্যে তার একাধিপত্য স্থাপনের জন্য ভেনিস ধর্মযোদ্ধাদের কাছে কনস্টান্টিনোপল অধিকার ক'রে সেখানে তাদের মনোনীত সিংহাসনচ্যুত সম্রাট দ্বিতীয় আইজাক ও তাঁর পুত্র আলেক্সিয়াসকে স্থাপনের প্রস্তাব দিল। অর্থের লোভে ধর্মযোদ্ধারা তাতেই রাজী হ'ল এবং কনস্টান্টিনোপল অধিকার ক'রে দ্বিতীয় আইজাককে

সিংহাসনে বসালো। তারা কন্‌স্টান্টিনোপল লুণ্ঠন করল। ধর্মযুদ্ধের নামে ভেনিসীয়রা তাদের বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল বহু দ্বীপে ও বন্দরে এবং কন্‌স্টান্টিনোপল শহরে অধিকার বিস্তার ক'রে প্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় বাণিজ্যে সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করল।

৩. ক্রুসেডের ফলাফল

সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রভাব ঃ দুই শতাব্দীব্যাপী এই ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সমাজ ও জীবনযাত্রা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সামন্ত-প্রভুদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় ইউরোপে শান্তির আবহাওয়া ফিরে আসে। বহু সামন্ত-প্রভু ধর্মযুদ্ধে জীবন দেন, অনেকে ধর্মযুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য ঋণে জর্জরিত, এমন কি, সর্বস্বান্ত হন। অসংখ্য ভূমিদাস ধর্মযুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়। অনেকে গ্রামে ফিরে আসে না, শহরে আশ্রয় নেয়। ফলে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রুসেডে অসংখ্য ভূমিদাস নিহত হওয়ায় ও অনেকে গ্রামে ফিরে না আসায় ভূমিদাসের অভাব ঘটে। ফলে ভূমিদাসরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পায়।

মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক জীবন ছিল গ্রামীণ, তাই তা ছিল অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর। প্রাচ্য জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় ইউরোপের মানুষ প্রাচ্যের আড়ম্বরপুর্ণ শৌখিন জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়। অসংখ্য বিলাসদ্রব্য এখন প্রাচ্য থেকে ইউরোপে আমদানি হ'তে থাকে। যেসব ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে ইউরোপ পরিচিত ছিল না, সেগুলি এখন তাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এখন ইউরোপীয়রা প্রাচ্যের সূক্ষ্ম রেশমী ও সুতি বস্ত্র, নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, রসুন, মশলা, কাচের আয়না প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার করতে থাকে। ইউরোপের বহু উৎপন্ন দ্রব্যও—যেমন, চামড়া, সলোম দামী চামড়া বা ফার, পশম, পশমের কাপড়, নানাপ্রকার ধাতুজ দ্রব্য—এখন প্রাচ্যে রপ্তানি হতে থাকে।

পৃথকভাবে শিল্পের বিকাশ ঃ এতদিন কারিগর ও শ্রম-

শিল্পীদেরও কৃষিকার্য করতে হ'ত। কিন্তু এখন জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ায় এবং শিল্পজাত দ্রব্য বাইরে রপ্তানি হ'তে থাকায় কারিগরি ও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কারিগর ও শ্রমশিল্পীরা কৃষিকার্য ছেড়ে সর্বক্ষণ কারিগরি ও শ্রম-শিল্পে আত্মনিয়োগ করে। শহরগুলিতে যেমন কারখানা গ'ড়ে ওঠে, তেমনি গ্রামাঞ্চলে গ'ড়ে ওঠে নানারকম কুটিরশিল্প। মেষপালন, পশম উৎপাদন, পশম থেকে সুতো কাটা, কাপড় বোনা, কাপড়ে রং করা প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা হয়ে ওঠে।

নূতন নূতন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব ঃ দেশে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটে। গ'ড়ে ওঠে বহু বাণিজ্য-কেন্দ্র। বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে লোকসংখ্যা বাড়ে, কল-কারখানা স্থাপিত হয়, গ'ড়ে ওঠে নূতন নূতন শহর।

অনুশীলনী

১। ক্রুসেডের পশ্চাতে কি কি কারণ নিহিত ছিল ?

২। প্রথম ক্রুসেডের বিবরণ দাও। প্রথম ক্রুসেডের ফলাফল বর্ণনা কর।

৩। তৃতীয় ক্রুসেডের বিবরণ দাও ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৪। চতুর্থ ক্রুসেডের বিবরণ দাও। একে কি সত্যই ক্রুসেড বলা যায় ? তোমার মতের সমর্থনে কারণ দেখাও।

৫। ক্রুসেডের ফলে ইউরোপীয় সমাজ-সভ্যতার কি পরিবর্তন ঘটেছিল ?

৬। ক্রুসেডের ফলে কিভাবে কৃষি থেকে শিল্প পৃথক হয়েছিল এবং কুটির-শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল ?

৭। ক্রুসেডের ফলে কেন নূতন বন্দর ও শহর গড়ে উঠেছিল ?

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) তুর্কীরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালালে সম্রাট — পোপ — — এর কাছে সাহায্য চান।

(খ) ক্রুসেডের জন্যে জনসাধারণকে উত্তেজিত ক'রে গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালান সন্ন্যাসী — এবং কপর্দকহীন —।

(গ) — খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধারা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। এর পর — খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের অধিকারে ছিল।

(ঘ) তুর্কী সুলতান সালাদিন — খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করলে তৃতীয় ক্রুসেড হয়। এই ক্রুসেডের নেতৃত্ব করেন পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট — —, ফ্রান্সের রাজা — — এবং ইংলণ্ডের রাজা — —।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। ক্রুসেড শব্দের অর্থ কি?

২। কাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করা হয়েছিল?

৩। ক্রুসেড কতদিন ধরে চলেছিল?

৪। কোন্ পোপ প্রথম ক্রুসেডের আহ্বান দেন?

৫। কত খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধারা জেরুজালেম উদ্ধার করেন?

৬। তৃতীয় ক্রুসেডের নেতৃত্ব করেন কারা?

৭। সালাদিন কে ছিলেন? তাঁর চরিত্র কিরূপ ছিল?

৮। সালাদিনের সঙ্গে রিচার্ডের কি সন্ধি হয়েছিল?

৯। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডকে 'সিংহহৃদয়' বলা হয় কেন?

১০। কোন্ পোপ চতুর্থ ক্রুসেডের ডাক দিয়েছিলেন?

নূতন নূতন নগরের উদ্ভব— নাগরিক জীবনধারা ৯

১. নূতন শহরের উদ্ভব ও বিকাশ

পুরাতন শহরগুলির অবস্থা ঃ রোম সাম্রাজ্যে বহু বড় শহর ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ঐসব শহরের অনেকগুলি ধ্বংস ও পরিত্যক্ত হয়েছিল, অনেক শহর নিতান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের জীবনধারায় এগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কারণ, ঐ সমাজ-ব্যবস্থায় ম্যানরীয় গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিরই ছিল প্রাধান্য। ম্যানরীয় গ্রামীণ জীবন ছিল কৃষিনির্ভর।

কিন্তু দক্ষ ও অদক্ষ কারিগর স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করত। তাদেরও খাদ্য সংগ্রহের জন্য কৃষিকার্য করতে হ'ত। তারা প্রয়োজনের অধিক কিছু উৎপাদন করত না। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় উদ্‌বৃত্ত দ্রব্যের চাহিদা ছিল না, উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন মানেই ছিল ক্ষতি। কৃষক, কারিগর, সকলেই ম্যানরে, অর্থাৎ গ্রামে, বাস করত। সামন্ত-প্রভুর সম্মতি ছাড়া কারও ম্যানরের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। এই অবস্থায় প্রাচীন শহরগুলির অবনতি ও ধ্বংসই ছিল স্বাভাবিক।

নূতন শহরের উদ্ভব ঃ ক্রুসেডের সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই উন্নতি ঘটেছিল। মানুষ ও মালপত্র এখন সারা দেশেই নির্বিঘ্নে ও অবাধে যাতায়াত করছিল। ফলে ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। তারা অনেক সময় প্রাচীন দুর্গগুলিতে তাদের ঘাঁটি গাড়ত। অনেক সময় তারা নদী-পারাপারের জায়গায়, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার চৌমাথায় বা কোন মঠের কাছে ঘাঁটি গেড়ে বসত। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ও উন্নতির ফলে ঐসব স্থানে লোক-সমাগম বৃদ্ধি পেতে লাগল। এইসব স্থানে ব্যবসার সঙ্গে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কারখানাও গড়ে উঠল। এইভাবে নূতন নূতন শহরের সূচনা হ'ল। ক্রুসেডের সময়ে বহু ভূমিদাস ভৃত্য, সঙ্গী ও সৈনিকরূপে সামন্ত-প্রভুদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছিল। অনেক ভূমিদাস তীর্থযাত্রীরূপেও গিয়েছিল। তাদের অনেকেই আর গ্রামে ফিরে গেল না, শহরে আশ্রয় নিল। ভূমিদাসত্বের চেয়ে শহরের স্বাধীন-জীবন তাদের কাছে লোভনীয় ছিল, তারা ব্যবসা বা কারখানার কাজে যোগ দিল। এইভাবে শহরগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে পুরাতন শহরগুলিও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। শহরগুলি প্রায়ই নদীতীরে বা সমুদ্রতীরে হ'ত, কারণ জলপথেই পণ্য-চলাচল সহজ ছিল।

এই যুগে নূতন পুরাতন যেসব শহর খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল,

সেগুলির মধ্যে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা, ফ্লোরেন্স, বার্সিলোনা, মিলান, লিয়ঁ, মার্সেঈ, প্যারিস, অর্লিয়ঁা, বোর্দো, বুলোনি, হামবুর্গ, ব্রেমেন, কোলোন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিউনিক, ডানজিগ, নুরেম্‌বুর্গ, ব্রেস্‌লো, অ্যান্টোয়ার্প, ব্রুজেস, গেণ্ট, লণ্ডন, ব্রিস্টল, ভিয়েনা, নভগরদ, মস্কো, কিয়েভ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

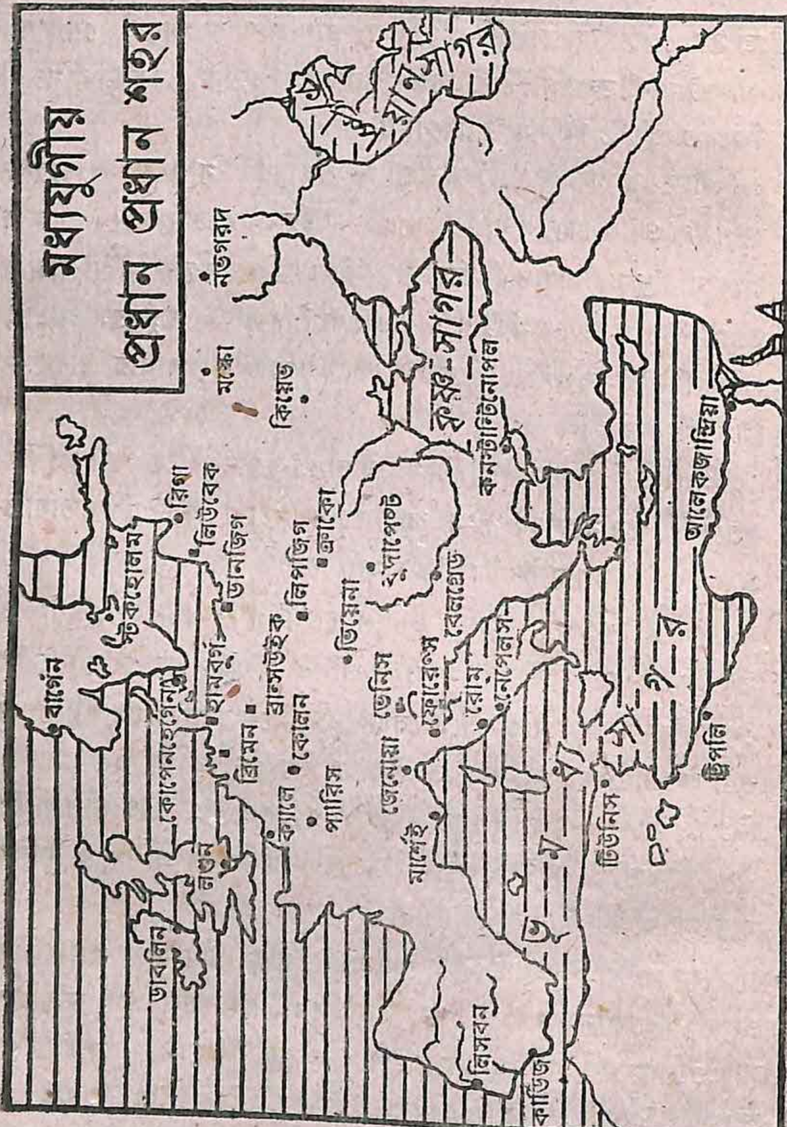
শহরের মানুষের জীবনযাত্রা : শহরের মানুষকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানার ওপরেই নির্ভর করতে হ'ত। গ্রামীণ জীবনে মানুষের প্রধান নির্ভর ছিল কৃষি। কিন্তু শহরে জীবন-যাত্রার প্রধান উপায় ছিল অর্থ উপার্জন এবং অর্থ দিয়েই খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, সকল কিছুর ব্যবস্থা করা যেত। তাই মুদ্রাই শহরবাসীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত।

ম্যানরীয় জীবনে সাধারণ মানুষ দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু শহুরে-জীবনে মানুষের ছিল স্বাধীনতা। তারা যত্রতত্র যাতায়াত করত, ভূমির বন্ধনে আবদ্ধ থাকত না।

অবশ্য, শহরেও শাসন ও শোষণ ছিল। ধনী ব্যবসায়ী ও কারখানার ধনী মালিকরা সাধারণ শ্রমিক ও কর্মচারীদের নানাভাবে শোষণ করত। ফলে শহরে যেমন একদিকে বহু অর্থশালী লোক বাস করত, তেমনি বাস করত অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত মানুষ। নিঃস্বের সংখ্যাও কম ছিল না। তাই শহরেও প্রাচুর্যের পাশাপাশি ছিল দারিদ্র্য ও অনটন, ধনীর সৌধের পাশে ছিল শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষের বস্তি।

শহরগুলি পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠেনি। প্রয়োজনে সেগুলি এলোমেলোভাবে গড়ে উঠেছিল। শহরগুলি খুব জনবহুল হ'লেও আজকালকার শহরের মতো এত বড় ছিল না। পথঘাটও সুপ্রশস্ত ছিল না। ঘিঞ্জি, নোংরা, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, আঁকাবাঁকা গলিই ছিল বেশি। সাধারণের কূপ থেকেই শহরে জলসরবরাহ হ'ত। শহরের আবহাওয়া ছিল অস্বাস্থ্যকর। মহামারী লাগলে তা রোধ করা খুবই কঠিন হয়ে উঠত। শহরের ঘরবাড়ি এত

ঘন ছিল যে, অগ্নিকাণ্ড হ'লে শহরের অনেক অংশই পুড়ে ছাই হয়ে যেত। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব। তা সত্ত্বেও



বাজার, হাট, দোকান-পাট ও কর্মচাঞ্চল্যে শহর সর্বদা সরগরম থাকত।

২. নাগরিক জীবনে নিগম বা সংঘ

ব্যবসায়ী ও শিল্পী সংঘ : শহরবাসীরা সংঘের মাধ্যমে জোটবদ্ধ হ'ত। এই সংঘকে গিল্ড্ (guild) বা নিগম বলা হয়। গোড়ার দিকে গিল্ডগুলি ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে নিয়েই গঠিত হ'ত। পরে কারখানাগুলিও গিল্ডের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়। গিল্ডগুলির ক্ষমতা ও অধিকার যেমন প্রচুর ছিল, তেমনি দায়িত্বও ছিল প্রচুর। ধরো, জুতোর কারিগরদের গিল্ড্ প্রয়োজনীয় সমস্ত জুতো সরবরাহের অধিকার পেল, সেই সঙ্গে এ দায়িত্বও তাকে নিতে হ'ল যে, গিল্ড্ উচিত মূল্যে ভালো জুতো সরবরাহ করবে।

ব্যবসা, কারিগরি ও কারখানার গিল্ডের সদস্যকে বলা হ'ত মাস্টার (master)। সদস্যরা নিজ নিজ কারবারে বা কারখানায় যাতে লোকাভাব না হয়, সেজন্য অ্যাপ্রেন্টিস (apprentice) বা শিক্ষানবীশ নিতেন। শিক্ষানবীশরা যখন কাজ শিখত, তখন তাদের খাওয়া-পরা ও থাকার খরচ কারবার বা কারখানার মালিকরা যোগাতেন। ঐসময়ে শিক্ষানবীশরা যা উৎপন্ন করত, তার মালিক ছিলেন তাঁরা। শিক্ষানবীশি শেষ হ'লে তারা কাজের খোঁজে শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়াত এবং যেখানে ভালো মজুরি পেত, সেখানে রোজ-মজুরিতে কাজ করত। ঐসময় তাদের বলা হ'ত জার্নিম্যান (Journeyman)। ঐভাবে কাজ করতে করতে কয়েক বছরে তাদের দক্ষতা বাড়ত এবং টাকা-পয়সাও জমত। তখন তারা নিজেদের কারখানা ও কারবার খুলে বসত এবং চাঁদা দিয়ে গিল্ডের সদস্য বা 'মাস্টার' হত। তাছাড়া গিল্ডের সদস্য হওয়ার জন্য তাকে উৎকৃষ্ট কিছু জিনিস তৈরী ক'রে দেখাতে হ'ত। ঐ উৎকৃষ্ট পণ্যকে বলা হ'ত মাস্টারপীস (masterpiece)। এখন তারা কারখানা ও কারবার চালাত ও শিক্ষানবীশ রাখত।

যাতে দক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে না পড়ে বা শ্রমিকের অভাব না হয়, সেজন্য গিল্ড্ ঠিক করত কতজনকে চাকরি দেওয়া হবে

বা কতজন শিক্ষানবীশ রাখা হবে। গিল্ড্ কাজের সময়, পরিবেশ, উৎপাদনের মান, মূল্যের উপযুক্ততা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করত। গিল্ড গুলি তাদের সদস্যদের জন্য বহু হিতকর কাজও করত।

৩. শহরগুলির স্বাতন্ত্র্য : বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য

শহরগুলি সামন্ত-প্রভুদের ভূমিতেই গ'ড়ে উঠেছিল। তাই শহরগুলির ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সামন্ত-প্রভুদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে এবং তাঁদের কর দিতে হ'ত। সাধারণত সামন্ত-প্রভুরা ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সংঘের সঙ্গেই চুক্তি করতেন। শহরের ব্যবসায়ী ও কারিগররা সংঘবদ্ধ থাকায় তারাই শহরের শাসন, পরিচালন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি সকল কাজই করত। এইভাবে শহরগুলিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পৌরসভা গড়ে উঠেছিল।

শহরগুলি যতোই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, ততোই তাদের ক্ষমতা ও অধিকার বাড়ছিল। অনেক শহর রাজকীয় সনদ-বলে স্বাধীনতা ভোগ করছিল। শহরের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই শহরের জন্য আইন তৈরী করত এবং নিজেরাই মুদ্রার প্রচলন করত। ভেনিস, ফ্লোরেন্স, পিসা, মিউনিক প্রভৃতি শহরে শক্তিশালী পরিবার রাজা হয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেছিল।

বুর্জোয়া শ্রেণী : শহরে যারা বাস করত, তাদের গোড়ার দিকে বার্গার বা বার্গেন্সিস বলত। পরে শহরবাসীরা বুর্জোয়া (bourgeois) নামেও পরিচিত হয়। কিন্তু শহরবাসীমাত্রকেই এখন বুর্জোয়া বলা হয় না। শহরের অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধান স্থান অধিকার করায় মুদ্রার প্রচলন ও ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। নাগরিক জীবনে প্রধান সম্পদ ছিল মুদ্রা, ক্ষমতার উৎস ছিল অর্থ। শহরে এইভাবে অর্থশালী একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এদের বলা হয় ধনিক শ্রেণী। এরা বড় বড় ব্যবসায়ী ও কল-কারখানার মালিক। এখন এই ধনিক শ্রেণীই 'বুর্জোয়া' নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

১। কিভাবে ইউরোপে নূতন শহরগুলির উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল ?

২। শহরগুলির উদ্ভব ও বিকাশে ক্রুসেডের প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। শহরের গিল্‌ড্‌গুলি সম্পর্কে কি জান ? নগর-জীবনে এগুলির গুরুত্ব কিরূপ ছিল ?

৪। শহরগুলির স্বাতন্ত্র্য ও শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

৫। শহরবাসীদের জীবনযাত্রার বর্ণনা দাও।

৬। 'বুর্জোয়া' শব্দটির মূল অর্থ কি ? এখন 'বুর্জোয়া' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় ?

৭। অ্যাপ্রেন্টিস ও জার্নিম্যান কাকে বলা হ'ত ? মাস্টারপীস কি ?

৮। মধ্যযুগের কতকগুলি নূতন শহরের নাম কর।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন :

১। অ্যাপ্রেন্টিস ও জার্নিম্যান কাদের বলা হয় ?

২। বুর্জোয়া বলতে ধনিকদের বোঝায় কেন ?

৩। গিল্‌ড্ কি ?

৪। মাস্টারপীস কাকে বলে ?

১০

মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য

মধ্যযুগে চীন—সপ্তম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

১. সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী চীন

হান বংশ : তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে চিন্-বংশীয় সম্রাট শি হুয়াংতির কথা পড়েছ। শি হুয়াংতি চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এই চিন-বংশের নাম থেকেই ও দেশের নাম হয়েছিল চীন।

শি হুয়াংতির মৃত্যুর পর (খ্রীঃ পূঃ ২০৬ অব্দে) চিন-বংশের পতন হয় এবং চীনে হান-বংশীয় সম্রাটরা রাজত্ব করতে থাকেন।

তাঁরা প্রায় চার শ বছর রাজত্ব করেছিলেন। মধ্যযুগে চীন যে অভাবনীয় উন্নতি করেছিল, তার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এই হান-বংশীয় সম্রাটরা। তাঁদের সময়েই চীনের অধিকার চীনের বাইরেও সম্প্রসারিত হয়েছিল।

হান সাম্রাজ্য পশ্চিমে মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণে হিন্দুকুশ পর্বতমালা, কুয়েন লুন্ পর্বতমালা ও আন্নাম, উত্তরে গোবি মরুভূমি ও পূর্বে চীনসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হান সম্রাটরা মধ্য-এশিয়া থেকে হূণদের বিতাড়িত করায় তারা দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। তাঁদের সময়েই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল এবং ভারত, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ ও বাণিজ্য ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

হান-বংশের পতন ঃ কিন্তু খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে হান-বংশের পতন ঘটে এবং চীনদেশ তিনটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জাতীয়তার দিক থেকে চীনের যে ঐক্য ও সংহতি গড়েছিল, তা বিনষ্ট হয়নি। এইভাবে প্রায় আরো চারশ বছর কাটে।

২. তাং-যুগ (৬১৮-৯০৭)

তাং-বংশের প্রতিষ্ঠা ঃ অবশেষে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে চীন পুনরায় একটি ঐক্যবদ্ধ বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। চীনের এই ঐক্যসাধন করেন তাং-সম্রাট তাই-ৎসুং।

চিন্-বংশীয় সম্রাটরা চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাং-বংশীয় সম্রাটরাও ছিলেন ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী।

তাং-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর-পশ্চিন চীনের তাং-রাজ্যের একজন সামন্তরাজ। এই তাং-রাজ্যের নাম থেকেই নাম হয়েছে তাং-বংশ। হান-বংশের পতনের পর চীনদেশে যে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দিয়েছিল, তা দূর ক'রে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন স্যুই-বংশীয় সম্রাটরা। কিন্তু তাঁরা এই ঐক্যকে

দৃঢ় ও স্থায়ী করতে পারেননি। তাঁদের রাজত্বকালে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকায় দেশে অশান্তি, বিক্ষোভ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দিয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার তাতার-জাতীয় লোকেরাও চীনদেশে ক্রমাগত হানা দিচ্ছিল। এইরূপ দেশব্যাপী বিক্ষোভ, বহিরাক্রমণ ও সুই সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে তাং-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

সম্রাট তাং তাই-ৎসুং ঃ তাং-রাজ্যের সামন্তরাজ তাং-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্রাট হ'লেও তাঁর মধ্যম পুত্র লি শিহ্-মিনের বুদ্ধি, দুঃসাহস ও বাহুবলই চীনকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর লি শিহ্-মিন-ই তাং তাই-ৎসুং নামে সম্রাট হয়েছিলেন (৬২৭ খ্রীঃ)। তিনিই তাং-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি তাঁর পিতার জীবদ্দশায় কেবল চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেননি, চীনের সাম্রাজ্য-সীমাকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের লু-চু দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর এবং উত্তরে আলটাই পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে কুয়েন লুন পর্বতমালা, আন্নাম ও কাম্বোডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সময়ে কেরিয়া চীন সাম্রাজ্যের বাইরে থাকলেও তাঁর পুত্র কোরিয়াকেও চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এইভাবে ভারত, পারস্য ও পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ঐসব রাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিবিড় বন্ধুত্ব গ'ড়ে উঠেছিল।

তাং-সম্রাটরাও বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের কোন গোঁড়ামি ছিল না। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। সম্রাট তাই-ৎসুং-এর রাজত্বকালেই আরবদেশে হজরত মহম্মদ ইসলামধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি বাইজান্টিয়াম, পারস্য ও চীনের সম্রাটদের কাছে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। বাইজান্টিয়াম-সম্রাট হেরাক্লিয়াস ও পারস্য-সম্রাট কাবাদ তাঁকে উন্মাদ মনে ক'রে তাঁর দূতদের উপহাস ক'রে বিদায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদের বাণী নিয়ে একদল আরব তাই-ৎসুং-এর দরবারে উপস্থিত হ'লে সম্রাট তাই-ৎসুং ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যে মুসলমানদের মসজিদ স্থাপনের অনুমতি দেন। ঐ সময়ে আরবরা ক্যানটনে যে মসজিদ স্থাপন করেন, সেটিই চীনদেশের প্রাচীনতম মসজিদ এবং ঐ মসজিদ আজও আছে। আরবদের সাত বছর পরে নেস্টোরিয়ান খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকরা এসেছিলেন। তাই-ৎসুং চীনদেশে খ্রীষ্টানদেরও ধর্মপ্রচার ও গির্জা স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন।

সম্রাট তাই-ৎসুং তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। সুবিশাল চীন সাম্রাজ্য বহু প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ঐসকল প্রদেশের শাসন রাজধানী শিয়ান-ফু থেকে নিযুক্ত শাসনকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা নির্বাহিত হ'ত। রাজকার্যে কর্মচারী-নিয়োগ পরীক্ষার ভিত্তিতেই হ'ত। তাই-ৎসুং কন্‌ফুসিয়াসের আদর্শ ও রাজনীতিতে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাই রাজকর্মচারীদের শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য কন্‌ফুসিয়াসের নির্দিষ্ট আদর্শ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে পাঠক্রম রচিত হ'ত। পূর্বে দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। ঐসব দণ্ডের প্রয়োগ অনেক সময় নিষ্ঠুর হ'ত। তাং-সম্রাটরা ঐসব আইন সংস্কার ক'রে দণ্ডবিধিকে সহজ ক'রে দেন।

সম্রাট তাই-ৎসুং কেবল দুঃসাহসী বীর ও রণকৌশলী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও গুণগ্রাহী। তাঁর প্রবলতম শত্রুও তাঁর হস্তে পরাজিত হয়ে তাঁর গুণমুগ্ধ অকৃত্রিম বন্ধুতে পরিণত হতেন। তাই-ৎসুং-এর মতো বীর, উদার ও মহৎ সম্রাট পৃথিবীতে বিরল।

৩. তাং যুগে সমৃদ্ধি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি : দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। ফলে কৃষকেরা নিরুপদ্রবে কৃষিকার্য করতে পারত। দেশে খাদ্যাভাব ছিল না। দেশে খাদ্যাভাব না থাকায় দেশে শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়েছিল। চীনা শিল্পদ্রব্যের মধ্যে

প্রধান ছিল রেশম ও রেশমী বস্ত্র এবং চীনামাটির বাসন। তাং-যুগে চীনা সাম্রাজ্য পারস্য ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় ঐসব দেশের সঙ্গে চীনদেশের ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। চীনের রেশমী বস্ত্র ও মৃৎপাত্রের চাহিদা ছিল সারা পৃথিবীতে। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে চীনদেশ ঐসময় পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশে পরিণত হয়েছিল।

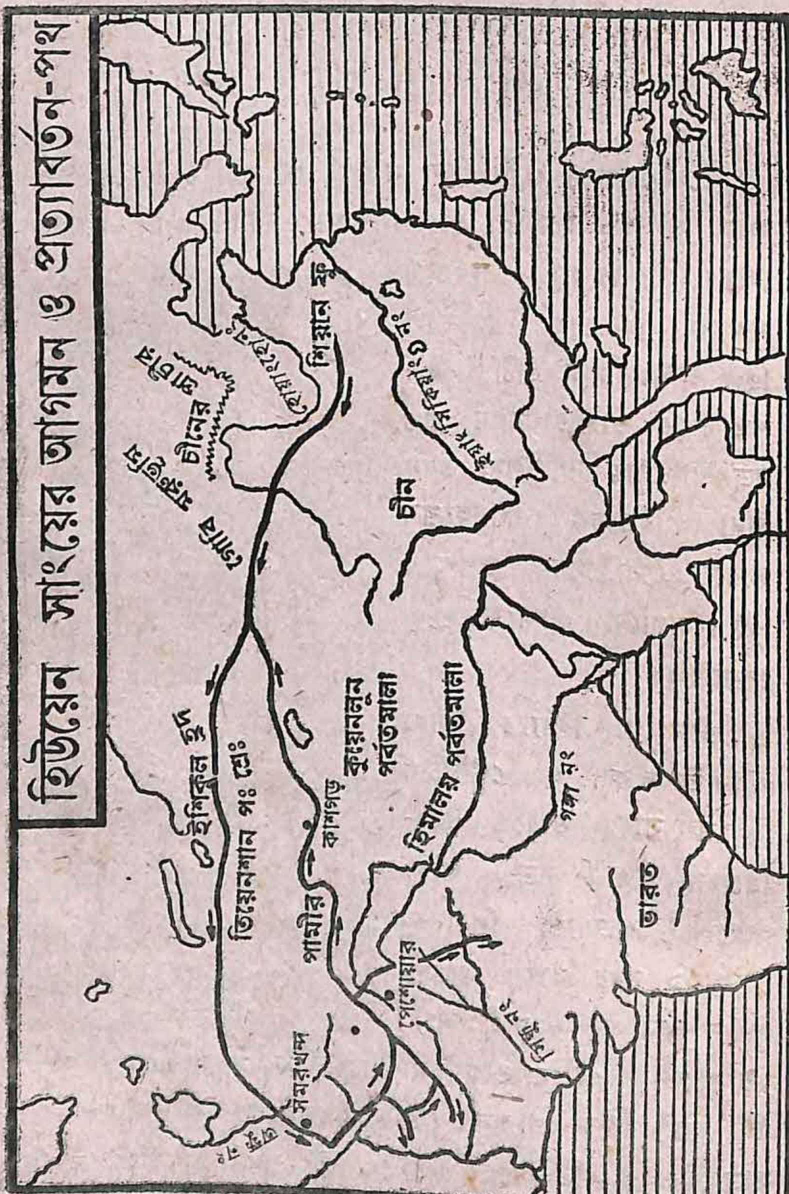
চীনে বৌদ্ধধর্ম ও হিউয়েন সাং ঃ হানযুগে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষ সম্পর্কে চীনাদের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে যখন গুপ্ত সম্রাটরা রাজত্ব করছিলেন, তখন চীনা পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারতে এসেছিলেন। তাং-যুগে এই যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।



হিউয়েন সাং

তাং-যুগে বিখ্যাত চীনা **পরিব্রাজক** ও বৌদ্ধাচার্য **হিউয়েন সাং** ভারতে এসেছিলেন। তিনি সম্রাট তাই-ৎসুংয়ের রাজধানী শিয়ান-ফু থেকে ২৯ বছর বয়সে ভারত-দর্শনে রওনা হন (৬২৯ খ্রীঃ অঃ)। তিনি তাঁর এই ভ্রমণ-কাহিনী সি ইউ কি নামে একটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর যাত্রাপথের অধিকাংশই তাং-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হ'লেও তা মোটেই সুগম বা নিরাপদ ছিল না। তাঁর এই যাত্রাপথ যেমন ছিল সুদীর্ঘ, তেমনি ছিল দুর্গম ও

বিপজ্জনক। তিনি উত্তর চীনের পথ ধ'রে গোবি মরুভূমি পার হয়ে, তিয়েন্‌শান পর্বতমালার দক্ষিণ পাদদেশ দিয়ে, ইসিক্‌কুল



হ্রদ পাশে রেখে মধ্য-এশিয়ার তাসখন্দ ও সমরখন্দ পার হয়ে

আফগানিস্থানের পথে পেশোয়ারে এসে পৌঁছেন। পথে বহু বিপদ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়। মরুভূমিতে অনেক সময় পথ হারিয়ে মৃত মানুষ ও পশুর কঙ্কাল দেখে তিনি পথ স্থির করেছিলেন। একবার গোবি মরুভূমিতে পথ হারিয়ে তিনি পাঁচদিন ও চাররাত্রি একবিন্দু জলও পান করতে পাননি। একবার এক হিমবাহ অতিক্রমকালে তাঁর বারোজন সহযাত্রী বরফে জমে গিয়েছিল। একবার এক নদীতে জল খেতে গিয়ে তিনি সীমান্তরক্ষীদের তীরের আঘাত থেকে কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি পথে যে কেবল বিপদেরই সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা নয়। পথে অনেক রাজা, যাঁদের অনেকেই তাং-সম্রাটের অনুগত ছিলেন, তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তিনি পথে বহু সমৃদ্ধ নগর, জনপদ ও রাজধানী দেখেছিলেন। চারদিকে দেখেছিলেন ভারতীয় ও বৌদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন।

ভারতবর্ষে তিনি ১৪ বছর ছিলেন। তিনি হিমালয় থেকে সিংহল পর্যন্ত ভারতের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন, তিনি ভারতীয় ভাষা ও শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন এবং অসংখ্য ভারতীয় পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন।

ফেরার পথে তিনি আফগানিস্থান থেকে কাশগর, ইয়ারকন্দ হয়ে কুয়েন লুন পর্বতমালার পাদদেশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে গোবি মরুভূমির কাছে চীনের মহাপ্রাচীরের প্রান্তে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

তাঁর ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে তাং-সম্রাট তাই-ৎসুং তাঁর অভ্যর্থনার জন্য রাজধানীতে রাজসিক ব্যবস্থা করেছিলেন। সেদিন ছুটি ঘোষিত হয়েছিল; পথ-ঘাট রঙিন পতাকায় সজ্জিত হয়েছিল; গীতবাদ্যে মুখর হয়েছিল নগর। বিশটি অশ্ববাহিত শকটে বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি নিয়ে হিউয়েন সাং বিজয়ীর বেশে রাজধানী শিয়ান ফুতে প্রবেশ করেছিলেন।

তাং-সম্রাটরা ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করলেও বৌদ্ধধর্মের প্রসারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁদের উৎসাহেই চীনা

সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিল্পকলার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মও কোরিয়া ও জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল।

শিক্ষা ঃ তাং-যুগে দেশে শিক্ষারও ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল। রাজকার্যে নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অপরিহার্য ছিল। ঐজন্য কনফুসিয়াস-রচিত গ্রন্থাদি বিশেষভাবে পড়ানো হ'ত এবং কনফুসিয়াস-নির্দেশিত আদর্শ ও রীতিনীতি বিষয়ে পরীক্ষার ভিত্তিতে সরকারী কাজে লোক নিয়োগ করা হ'ত। এজন্য শিক্ষালাভকে সকলেই জীবিকা-অর্জনের অন্যতম উপায় ব'লে মনে করত। দেশে বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

সাহিত্য ঃ হান যুগে থেকেই চীনা সাহিত্যের উন্নতি হ'তে থাকে। তবে তাং-যুগকেই চীনা সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ মনে করা হয়। এই যুগেই তু ফু, লিপো, পো চু-ই প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চীনা কবিরা জন্মগ্রহণ করেন।

মুদ্রণশিল্প ঃ শিক্ষার বিস্তার ও সাহিত্যের প্রচারে মুদ্রণশিল্প বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। চীনারাই সর্বপ্রথম রেশমী কাপড়ের একপ্রকার কাগজের ওপর খোদাই-করা হরফের ছাপ তুলে ছাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। গোটা পৃষ্ঠাটাই খোদাই ক'রে নেওয়া হ'ত। চীনা বইগুলির এক পৃষ্ঠা ছাপা হ'ত, আর এক পৃষ্ঠা ফাঁকা থাকত। তারপর ঐসব ছাপানো পৃষ্ঠা একসঙ্গে গেঁথে বই তৈরি হ'ত। তাং-সম্রাট মিং হুয়াংয়ের (৭১২-৭৫৬ খ্রীঃ অঃ) সময়েই সম্ভবত মুদ্রণরীতি প্রবর্তিত হয়।

শিল্পকলা ঃ তাং-যুগে চীনা শিল্পীরা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাতেও অভাবনীয় প্রতিভার পরিচয় দেন। ঐসব শিল্পেও ভারতীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ যুগে আঁকা নিসর্গচিত্রগুলি আজও মানুষকে বিস্মিত করে।

চা ঃ মানব সভ্যতায় চীনাদের একটি অবিস্মরণীয় দান—চা। চরযৌবন লাভের বাসনা সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষকে প্ররোচিত করেছে। মানুষকে চিরযৌবন দিতে পারে এমন কোন ভেষজের সন্ধান থেকেই সম্ভবত হান যুগে চা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

চা সহজেই ক্লান্তি দূর ক'রে মানুষকে সতেজ ও উৎফুল্ল করে। তাং-যুগে চা-এর ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে। ঐ যুগের কবিরা চায়ের প্রথম পেয়ালা, দ্বিতীয় পেয়ালা, তৃতীয় পেয়ালা প্রভৃতির মহিমাগানে মুখর হয়ে ওঠেন। চীনদেশ থেকে চা কোরিয়া, জাপান এবং পরে পৃথিবীর বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাং যুগে চীন সকল দিক থেকেই আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

৪. সুং-যুগে চীন

সুং-বংশের শাসনকালঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে তাং-সম্রাটরা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে, ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, তাং-বংশের পতন ঘটে। পুনরায় চীনদেশে অনৈক্য দেখা দেয়। কিন্তু এই অনৈক্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সুং-বংশীয় সম্রাটদের অধীনে চীনদেশ পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। এই ঐক্যবদ্ধ চীনে সুং-বংশীয় সম্রাটরা প্রায় দেড়শ বছর (৯৬০-১১২৭) রাজত্ব করেন। কিন্তু ঐ সময়ে চীনের উত্তরে যাযাবর কিন্ তাতাররা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুং-সম্রাটদের কাছ থেকে তারা উত্তর-চীন অধিকার ক'রে নেয়। তখনও সুং-বংশীয় সম্রাটরা দক্ষিণ-চীনে রাজত্ব করতে থাকেন। আরো প্রায় একশ সত্তর বছর (১১২৭-১২৯৫) তাঁরা দক্ষিণ-চীনে রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজধানী ছিল হ্যান চাও।

সুং-শাসনকালে চীনদেশের অবস্থা ঃ সুং-সম্রাটদের শাসনকালে চীনদেশের অবস্থা যে ভালো ছিল, তার প্রমাণ ঐসময়ে চীনদেশে বিদ্রোহের অভাব। সুং-শাসকরা অত্যাচারী ছিলেন না, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হ'লেও দেশজয়ের জন্য তাঁরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করেননি; তাঁরা উন্নত মানের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন।

সুং-সম্রাটরা সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লেও হান ও তাং যুগে চীনে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে অগ্রগতি হয়েছিল, সুং-যুগে তা অব্যাহত ছিল। সুং-যুগে চীনদেশ সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে,

চিত্রকলায় ও মৃৎশিল্পে খুবই উন্নত ছিল। বিজ্ঞানেও চীন ঐসময়ে অসাধারণ উন্নতি করেছিল। সুং-যুগে চীন বারুদ ও দিগ্‌নির্ণয়যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল। পূর্বে মুদ্রণের জন্য গোটা পৃষ্ঠা খোদাই ক'রে নেওয়া হ'ত; সুং-যুগেই প্রথম মুদ্রণের জন্য পৃথক পৃথক হরফের ব্যবহার চালু হয়।

জনহিতসাধনের চেষ্টা: সুং-সম্রাটদের সময়ে দেশের রাজনীতিবিদ্‌রা একালের মতো পুরাপন্থী ও নব্যপন্থী, দু দলে বিভক্ত ছিলেন। সম্রাটের দরবারে পুরাপন্থীদের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও উদারমনা সম্রাটরা নব্যপন্থীদেরও প্রগতিশীল পরিকল্পনা কার্যকর করার সুযোগ দিতেন। এইভাবে একবার ওয়াং আন্‌-শির নেতৃত্বে নব্যপন্থীরা শাসন-ব্যবস্থায় প্রাধান্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। ওয়াং আন্‌-শির চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শ ছিল সে যুগের তুলনায় অনেক অগ্রগামী। তিনি জনসাধারণকে দুঃখ-দৈন্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন।

দেশের কৃষকরা প্রায়ই সুদখোর মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকত। ওয়াং আন্‌-শি কৃষকদের সরকারী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে গ্রীষ্মকালে ঋণ পেত এবং শরৎকালে ফসল উঠলে ঋণ শোধ করত। তিনি সুদের হার ও ঋণদানের আইন-কানুনও কৃষকদের পক্ষে সুবিধাজনক ক'রে দেন কৃষকদের সরকারী ঋণ পেতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য দেশের সর্বত্র অসংখ্য ঋণদান-কেন্দ্র খোলা হয়।

শস্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর প্রজাদের আর্থিক অবস্থা নির্ভর করত। অনেক সময় শস্যের মূল্য এত কমে যেত যে, কৃষকদের ক্ষতি হ'ত এবং কৃষকরা নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য কিনতে পারত না। তাই ওয়াং আন্‌-শি ন্যায্যমূল্যে সরকার কর্তৃক কৃষকদের কাছ থেকে শস্য কেনার ব্যবস্থা করেন। শস্যের মূল্যও তিনি বেঁধে দেন। এর ফলে দেশে শস্যের ফলন কম হ'লে শস্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়ে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করতে পারত না।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্বরূপে শস্যের যে অংশ নেওয়া হ'ত, তা রাজধানীতে আনা হ'ত। ফলে সম্রাটের খাদ্যভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে সেই দ্রুতগামী যানবাহনের অভাবের যুগে দ্রুত খাদ্যশস্য পাঠানো যেত না। তাই ওয়াং আন্-শি ব্যবস্থা করেন যে, যে অঞ্চলে রাজস্বরূপে যে শস্য সংগৃহীত হবে, তা সেই অঞ্চলেই থাকবে। এতে রাজধানীতে শস্য আনার ব্যয় যেমন কমবে, তেমনি প্রজাদের পক্ষে খাদ্যশস্য সুলভ ও সহজলভ্য হয়ে উঠবে, সহজেই দুর্ভিক্ষ নিবারণ সম্ভব হবে।

কর-ভারেও প্রজারা জর্জরিত ছিল। তাই ওয়াং আন্-শি সাধারণ প্রজাদের কর হ্রাস ক'রে বিত্তবান্ ব্যক্তিদের ওপর অধিকতর কর ধার্য করেন। তিনি সেই সুদূর অতীতেও আধুনিক কালের মতো ধনী ব্যক্তিদের সম্পত্তিকর ও আয়কর দিতে বাধ্য করেন।

সেযুগে এইসব প্রগতিশীল ব্যবস্থার প্রবর্তন সহজসাধ্য ছিল না। এজন্য ওয়াং আন্-শিকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওয়াং আন্-শি-প্রবর্তিত অনেক জনহিতকর ব্যবস্থাই পরিত্যক্ত হয়।

মঙ্গোলজাতির অভ্যুত্থানের ফলে সুং-সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

৫. মঙ্গোল জাতির অভ্যুত্থান—চেঙ্গিস খান

মঙ্গোল জাতি ঃ উত্তর চীনে কিন্ তাতাররা এবং দক্ষিণ চীনে সুং-বংশীয় সম্রাটরা যখন রাজত্ব করছিলেন, তখন চীনের উত্তরে মঙ্গোল জাতির লোকেরা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। এরা ছিল যাযাবর ও নানা উপজাতিতে বিভক্ত। এদের জীবিকা ছিল শিকার ও লুটপাট। এরা ঘোড়ায় চড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দলবদ্ধভাবে যেত; ঘোড়ার দুধ ও মাংস খেত, ছাউনি ফেলে এক-এক জায়গায় কিছুদিন থাকত। তারপর ঐ জায়গা ছেড়ে খাদ্য ও চারণভূমির সন্ধানে অন্য জায়গায় চলে যেত। এরা ছিল

বলিষ্ঠ, দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী। এরা ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে ব'সে তীর ছুঁড়ে শিকার বা শত্রুকে ঘায়েল করত। এদের হাতের গদা ও বর্শাও ছিল ভয়ংকর। বিভিন্ন মঙ্গোল উপজাতির মধ্যে মাঝে মাঝে বিবাদ বাধত। তা সত্ত্বেও একটা শিথিল জাতীয়তা-বোধ ও ভাষার বন্ধনে এরা আবদ্ধ ছিল। উপজাতীয় নেতারা খান নামে পরিচিত ছিলেন। কবুল খান ছিলেন ঐরকম একজন উপজাতীয় নেতা। তিনি অনেকগুলি মঙ্গোল উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং কিন্ তাতারদের অধীনতা থেকে মঙ্গোলদের মুক্ত করেন। তবে মঙ্গোল জাতিকে একটি দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত করেন কাবুল খানের পৌত্র চেঙ্গিস খান।

চেঙ্গিস খান ঃ চেঙ্গিস খানের প্রকৃত নাম তেমুচিন। তেমুচিনের বয়স যখন তেরো, তখন তাঁর পিতা নিহত হ'লে বালক তেমুচিন দলনেতা হন। তেমুচিন বালক হ'লেও ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমান ও দুঃসাহসী। তিনি বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী উপজাতি-গুলিকে পদানত ক'রে মঙ্গোল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি তাতারদের ওপরও আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াং খানকে পরাজিত ক'রে কারাকোরাম অধিকার করেন। এখন থেকে কারাকোরামই মঙ্গোলদের রাজধানী হয়। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোল উপজাতিসমূহের প্রতিনিধি-সভা বা কুরিল্তাই তাঁকে মঙ্গোলদের কাগান বা প্রধান খান নির্বাচিত করে। তিনি চেঙ্গিস খান নামে পরিচিত হন। 'চেঙ্গিস' শব্দের অর্থ সর্বাধিক শক্তিমান্। চেঙ্গিস খান সমগ্র মঙ্গোলিয়ায় অধিকার বিস্তার ক'রে উত্তর চীন ও কোরিয়া অধিকার করেন।



চেঙ্গিস খান

তিনি গোড়ার দিকে দক্ষিণ চীনের সুং-বংশীয় সম্রাটদের সঙ্গে মিত্রতা রেখে চলেন।

চেঙ্গিস খান একটি দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনী গ'ড়ে তোলেন। তীর-ধনুক ও বর্শা মঙ্গোলদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র হ'লেও ঐ সময় চীনারা বারুদ আবিষ্কার করায় তিনি যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও প্রবর্তন করেন। অল্পকালের মধ্যেই পূর্বে পীত সাগর থেকে পশ্চিমে আরল হ্রদ পর্যন্ত সুবিশাল অঞ্চল মঙ্গোল অধিকারে যায়।

এই সময়ে চেঙ্গিস খানের বয়স প্রায় ষাট হ'লেও তাঁর উৎসাহ ও কর্মশক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণে মধ্য-এশিয়ার খোয়ারিজ্‌ম্ বা খিবার শাহ্ এক বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। মঙ্গোল বণিকরা তুর্কী শাসনকর্তার হস্তে নিগৃহীত হ'লে ঐ শাসনকর্তার শাস্তি দাবি ক'রে চেঙ্গিস খান শাহের দরবারে দূত পাঠান। শাহ্ চেঙ্গিসের দূতকে অপমান ও লাঞ্ছনা ক'রে হত্যা করলে চেঙ্গিস খান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে খোয়ারিজম্ আক্রমণ করেন। চেঙ্গিস দুর্ধর্ব বাহিনীর হস্তে বোখারা, বল্‌খ্, সমরখন্দ, মার্ভ, নিশাপুর, তাসখন্দ, হীরাট প্রভৃতি বিখ্যাত নগরগুলি একে একে শ্মশানে পরিণত হয়। ধ্বংস, হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব চালিয়ে মঙ্গোল বাহিনী দ্রুত অগ্রসর হয়। মঙ্গোল বাহিনীর প্রতিরোধের পরিণাম যে কী ভীষণ, তা দেখাবার জন্য চেঙ্গিস মৃত শত্রুদের মাথার খুলি দিয়ে নকল পাহাড় বানান। চেঙ্গিসের সেনাপতি সুবোতাই পলায়মান শাহের পশ্চাদ্‌ধাবন ক'রে খোরাসান ও পারস্য জয় ক'রে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছেন। তিনি একের পর এক জনপদ জয় করতে করতে রাশিয়ায় পৌঁছলে কিয়েভের সামন্তরাজ তাঁর হস্তে পরাজিত হন। সুবোতাই ক্রিমিয়া ও বুলগেরিয়ায় হানা দেন।

এই বিজয়-অভিযানের মধ্যে ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিসের মৃত্যু হয়। এইভাবে চীন সাগর থেকে রাশিয়া এবং আলটাই পর্বতমালা থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত ভূভাগে মঙ্গোল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

৬. কুবলাই খান

প্রধান খান পদে কুবলাই খান: চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মঙ্গোল কুরিলতাই চেঙ্গিসের তৃতীয় পুত্র ওগোতাইকে প্রধান খান নির্বাচিত করে। ওগোতাইয়ের সময়ে মঙ্গোল বাহিনী আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও মেসোপটেমিয়া অধিকার করে, হাঙ্গেরি ও পোল্যাণ্ডে অভিযান ক'রে ধ্বংস, লুণ্ঠন ও হত্যার তাণ্ডব চালায়। সমগ্র চীনদেশ মঙ্গোল অধিকারে আসে। কিন্তু এইসময় অকস্মাৎ ওগোতাইয়ের মৃত্যু হয়। এখন চেঙ্গিসের কনিষ্ঠ পুত্র টুলির পুত্র মঙ্গু প্রধান খান নির্বাচিত হন। তাঁর ভাই হুলাগু বাগদাদ অধিকার ক'রে খালিফা সহ বাগদাদের অগণিত অধিবাসীকে হত্যা করেন। তিনি দামাস্কাস ও অ্যান্টিওক অধিকার ক'রে কন্স্টান্টিনোপলের কাছে গিয়ে পৌঁছেন। মিশরের মামেলুক তুর্কীদের হস্তে মঙ্গোল বাহিনী পরাজিত হ'লে দক্ষিণে মঙ্গোল অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। এই সময়ে প্রধান খান মঙ্গুর মৃত্যু হ'লে ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোল কুরিলতাই মঙ্গুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুবলাই খানকে প্রধান খান নির্বাচিত করে।



সম্রাট কুবলাই খান

কুবলাই খান মঙ্গুর মৃত্যুর পূর্বে চীনের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি চীনকে স্বদেশের মতো ভালোবেসেছিলেন। কুবলাই খান চীন ও তার পার্শ্ববর্তী মঙ্গোল অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ক'রে তুললেন। এখন মঙ্গোল-অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলে চেঙ্গিসের অন্যান্য বংশধররা রাজত্ব করতে লাগলেন। তাঁরা সকলে অবশ্য প্রধান খান কুবলাই খানের অধীনতা স্বীকার ক'রে চলতেন।

কুবলাই খানের ধর্ম : 'খান' শব্দ থেকে মনে হ'তে পারে, মঙ্গোলরা মুসলমান ছিল। কিন্তু তা নয়। চেঙ্গিস খানের সময়েও মঙ্গোলরা আকাশ-দেবতার পূজো করত। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত থাকায় কুবলাই খান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কুবলাই খান শান্তির পথ গ্রহণ করলেও তিনি দুর্বল শাসক ছিলেন না। তিব্বত তাঁর পদানত হয়েছিল। তাঁর বিজয়বাহিনী দক্ষিণে মালয় ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। তাঁর নৌবাহিনী জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় অভিযান চালিয়েছিল। তবে ঐসব অঞ্চল মঙ্গোল পদানত হয়নি।

কুবলাই খান চীনা সভ্যতা-সংস্কৃতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর প্রবল কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা ছিল।

ইউয়ান রাজবংশ : ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খান চীনদেশে যে মঙ্গোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তা ইউয়ান রাজবংশ নামে পরিচিত। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খানের মৃত্যু হয়। ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত ইউয়ান-বংশীয় সম্রাটগণ চীনে রাজত্ব করেন।

৭. মার্কো পোলো ও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত

ভ্রমণবৃত্তান্তের পরিচয় : মার্কো পোলো ছিলেন একজন ভেনিসীয় বণিক। তিনি দীর্ঘকাল চীনদেশে ছিলেন। পরে তিনি যখন স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন, তখন ইতালির ভেনিস ও জেনোয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে মার্কো পোলো বন্দী হয়েছিলেন। কারাগারে থাকার সময়ে তিনি রাস্টিসিয়ানো নামে এক সহবন্দীকে চীন ও প্রাচ্য সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর সব অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। রাষ্টিসিয়ানো তা লিখে রেখেছিলেন এবং সেগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। ঐ বইয়ে বর্ণিত বিষয় তখন অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও তা ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং চীনদেশ ও প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপবাসী কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল।

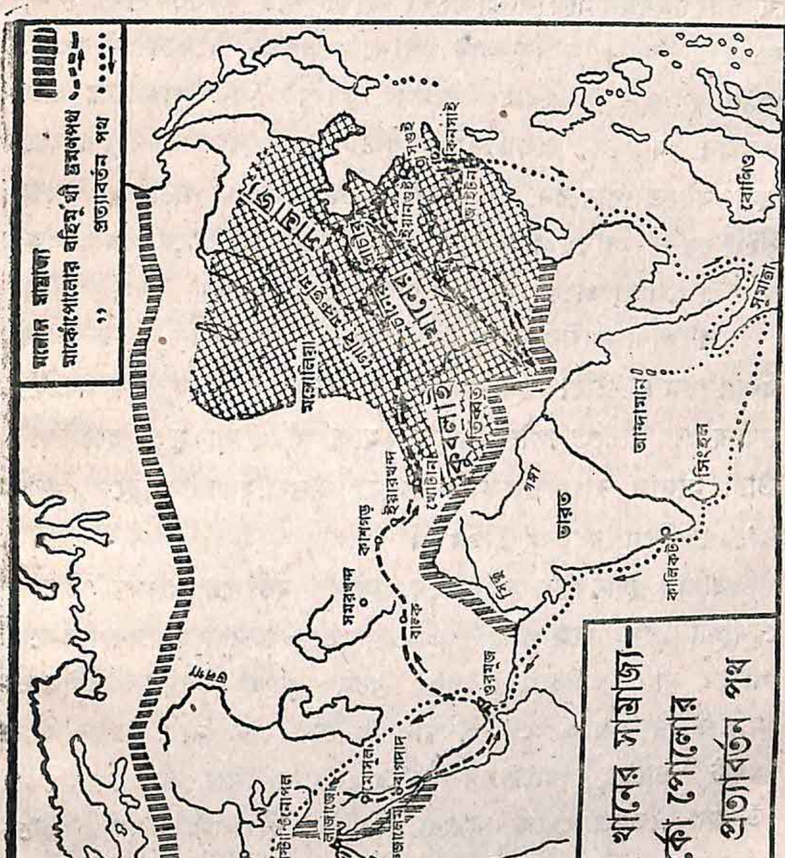
মার্কো পোলোর চীনে গমন ঃ এই বিবরণ থেকে জানা যায়, ভেনিসের নিকলো পোলো ও মাফিও পোলো নামে দু ভাই ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। তাঁরা ব্যবসার জন্য কন্‌স্টান্টিনোপলে থাকতেন। তাঁরা ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ক্রিমিয়া ও কাজান হয়ে গিয়েছিলেন বোখারা। ঐসময়ে কুবলাই খানের দূতরা পারস্যে তাঁর ভাই হুলাগুর দরবারে এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পোলো-ভাইদের দেখা হ'লে তাঁদের সঙ্গে পোলো-ভাইরা কুবলাই খানের দরবারে যান। কুবলাই খান তাঁদের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হন এবং ইউরোপ থেকে একশ জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আনবার জন্য তাঁদের দেশে পাঠিয়ে দেন। পোলো-ভাইরা দেশে ফিরে রোমের পোপকে এ সম্পর্কে জানান। কিন্তু পণ্ডিতরা কেউ ঐ সুদূর দেশে যেতে সম্মত হন না। শেষে মাত্র দুজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় দুবছর পরে তাঁরা আবার চীনদেশে রওনা হন। তাঁরা সঙ্গে নেন নিকলোর তরুণ পুত্র মার্কোকে।



মার্কো পোলো

এবারে কিন্তু তাঁরা অন্য পথে গেলেন। তাঁরা প্রথমে গেলেন জেরুজালেম। সেখান থেকে পারস্যোপসাগরের তীরে ওরমুজ বন্দরে। কিন্তু জলপথে না গিয়ে তাঁরা পারস্যের মরুভূমির মধ্য দিয়ে বল্‌খ, কাশগর ও খোটান হয়ে হোয়াং হো নদীর তীর ধরে গেলেন চীনের রাজধানী পিকিংয়ে (বেইজিংয়ে)। দেশ থেকে পিকিং পৌঁছতে তাঁদের প্রায় আড়াই বছর লেগেছিল। মার্কো পথে তুর্কী ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। পোলোরা কুবলাই খানের

দরবারে এসে পৌঁছলে কুবলাই খান মার্কোকে দেখে মুগ্ধ হন। মার্কোকে তিনি রাজকার্যে নিয়োগ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা কাজে নানাস্থানে পাঠান। মার্কো কিছুদিনের জন্য ইয়াংচাও প্রদেশের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হন।



কুবলাই খানের সাম্রাজ্য—মার্কো পোলোর গমন ও প্রত্যাবর্তন পথ

পোলোরা চীনদেশে ষোল বছরেরও বেশি ছিলেন। চীনদেশে তাঁরা খুব সুখে থাকলেও দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে-

ছিলেন। কিন্তু কুবলাই খাঁ তাঁদের আসতে দিচ্ছিলেন না। এই সময় দেশে ফেরার একটি সুযোগ মিলল। পারস্যের খান হুলাগুর পৌত্র রাজা আরগনের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল। তাঁর রানী ছিলেন মঙ্গোল রাজকন্যা; মৃত্যুকালে রানী স্বামীকে এই অঙ্গীকার করান যে আরগন যেন মঙ্গোল রাজকন্যা ছাড়া আর কাউকে বিবাহ না করেন। আরগান কুবলাই খানকে একজন মঙ্গোল রাজকন্যা পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। কুবলাই খান আরগনের জন্য একজন মঙ্গোল রাজকন্যাকে পাঠান। ঐ রাজকন্যা স্থলপথের ক্লেশ সইতে পারবেন না ভেবে তাঁকে জলপথে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। নাবিকরা অজানা পথে আসতে ভয় পেলে পথপ্রদর্শকরূপে পোলোরা তাদের সঙ্গে আসার অনুমতি পান।

পোলোরা রাজকন্যাকে নিয়ে দক্ষিণ চীনের কোন বন্দর থেকে রওনা হন। তাঁরা সুমাত্রা ও দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দুবছর পরে পারস্যে পৌঁছেন। ইতিমধ্যে আরগনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁরা মঙ্গোল রাজকন্যাকে আরগনের উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পণ ক'রে ভেনিসে ফেরেন (১২৯৫)।

তাঁরা সুদীর্ঘকাল চীনদেশে মঙ্গোল দরবারে থাকায় তাঁদের বেশভূষা ছিল মঙ্গোলীয়। তাই আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদের চিনতে পারেন না। প্রাচ্যের বিপুল ধনসম্পদ্ ও তাঁদের অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার কথাও কেউ বিশ্বাস করতে চান না। তখন তাঁরা একটি ভোজের আয়োজন ক'রে সেখানে নিজেদের পোশাকের ভাঁজের ভেতর থেকে অসংখ্য মণিমুক্তা, হীরা-জহরত বার ক'রে সকলকে চমকে দেন। মার্কো পোলো তাঁর কথাবার্তায় প্রায়ই চীনদেশের কোটি কোটি মানুষ ও কোটি কোটি মুদ্রার কথা বলতেন। তাই লোকে তাঁকে মার্কো মিলিয়ন্স্ বা মার্কো কোটি-কোটি বলে ঠাট্টা করত।

মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তকে গোড়ার দিকে অনেকে আজগুবি ও অবিশ্বাস্য মনে করলেও পরে তা ইউরোপীয়দের চীন ও প্রাচ্য

সম্পর্কে কৌতূহলী ক'রে তুলেছিল। মার্কো পোলো উত্তর চীনকে ক্যাথে, দক্ষিণ চীনকে মান্‌জি এবং রাজধানী পিকিংকে কাম্বালাক নামে বর্ণনা করেছিলেন। চীন ইউরোপীয়দের কাছে হয়ে উঠেছিল স্বপ্নের দেশ। চীনে ও প্রাচ্যে যাওয়ার জন্য ইউরোপীয়রা জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় মত্ত হয়েছিল। এর ফলে তারা একদা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে ভারত ও দূর প্রাচ্যে যাওয়ার জন্য জলপথ এবং আমেরিকার দুই মহাদেশ আবিষ্কার করেছিল।

অনুশীলনী

১। চিন্‌ রাজবংশের পতন ও তাং রাজবংশের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী চীনের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

২। হান্‌-বংশীয় সম্রাটদের শাসনকাল সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। কিভাবে চীনে তাং-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল? 'তাং-বংশ' নাম হয়েছিল কেন?

৪। তাং-বংশীয় সম্রাটদের মধ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন? তাঁর আমলে সাম্রাজ্য কিরূপ বিস্তার লাভ করেছিল?

৫। তাং তাই-ৎসু কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। কোন্‌ রাজবংশের শাসনকালকে চীনের স্বর্ণ যুগ বলা হয়? কেন বলা হয়? ঐ যুগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। কোন্‌ চীনা সম্রাটের আমলে হিউয়েন সাং ভারতে এসেছিলেন? তিনি কোন্‌ পথে এসেছিলেন ও ফিরে গিয়েছিলেন? তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

৮। চীনে মুদ্রণ-ব্যবস্থার আবিষ্কার ও বিকাশ সম্পর্কে যা জান লিখ।

৯। চীনে চায়ের আবিষ্কার ও প্রচলন সম্পর্কে যা জান লিখ।

১০। সুং-সম্রাটদের রাজত্বকালে চীনের অগ্রগতি বর্ণনা কর।

১১। ওয়াং আন্‌-শি কে ছিলেন? তিনি প্রজাদের কল্যাণের জন্য কি কি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন?

১২। মঙ্গোল জাতির অভ্যুত্থান সম্পর্কে কি জান?

১৩। চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও।

১৪। কোন্ প্রধান খানের সময়ে মঙ্গোল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল? ঐসময়ে মঙ্গোল সাম্রাজ্য কিরূপ বিস্তৃত ছিল?

১৫। কুবলাই খান কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৬। কুবলাই খান চীনে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম কি? ঐ রাজবংশ কতদিন রাজত্ব করেছিল?

১৭। মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৮। মার্কো পোলো কোথাকার অধিবাসী ছিলেন? তিনি কোন্ পথে পিকিং গিয়েছিলেন এবং কোন্ পথে চীন থেকে স্বদেশে ফিরেছিলেন?

১৯। শূন্যস্থান পূরণ কর: (ক) তাং সাম্রাজ্য পূর্বে — দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিমে — সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (খ) তাং বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন ——। (গ) তাং সম্রাটদের রাজধানী ছিল ——। (ঘ) — তাতাররা উত্তর চীন অধিকার করলে সুং-বংশীয় সম্রাটরা — চীনে রাজত্ব করতে থাকেন। (ঙ) মঙ্গোল দলপতি — মঙ্গোল উপজাতিগুলিকে কিন্ তাতারদের অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন। (চ) তাঁর — চেঙ্গিস খান মঙ্গোলদের এক বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করেন। (ছ) চেঙ্গিস খানের প্রকৃত নাম —। (জ) তাঁর রাজধানী ছিল —। (ঝ) মঙ্গোল — চেঙ্গিস খানকে প্রধান খান নির্বাচিত করে। (ঞ) চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর — মঙ্গোলদের প্রধান খান নির্বাচিত হন। (ট) কুবলাই খান চীনে যে মঙ্গোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তা — রাজবংশ নামে পরিচিত। (ঠ) মার্কো পোলো তাঁর চীন ও প্রাচ্য ভ্রমণের কথা কারাগারে — কে বলেছিলেন।

২০। ঠিক উক্তির নিচে দাগ দাও:

(ক) তাং-বংশীয়/হান-বংশীয়/সুং-বংশীয় সম্রাটদের সময়ে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়েছিল। (খ) কুবলাই খান ছিলেন মঙ্গোল প্রধান খান চাগতাই-এর/সুবোতাই-এর/মঙ্গুর পুত্র। (গ) চেঙ্গিস খানের রাজধানী ছিল শিয়ান ফু/কারাকোরাম/পিকিং। (ঘ) কুবলাই খান মুসলমান/বৌদ্ধ/খ্রীষ্টান ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। তাং রাজবংশ নাম হয়েছিল কেন?

২। তাং রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন?

৩। হজরত মহম্মদ কোন্ চীনা সম্রাটের কাছে দূত পঠিয়েছিলেন?

৪। কোন্ যুগে চীনে মুদ্রণ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল ?

৫। তাং সম্রাটদের রাজধানী কোথায় ছিল ?

৬। চেঙ্গিস খানের প্রকৃত নাম কি ?

৭। চেঙ্গিস খানের রাজধানী কোথায় ছিল ?

৮। চীনে ইউয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন ?

৯। মার্কো পোলো কোথাকার অধিবাসী ছিলেন ?

১০। হুলাগু কে ছিলেন ?

১১। ইউরোপের কোন্ দেশ মঙ্গোল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল ?

১২। কি ব'লে ও কেন লোকে মার্কো পোলোকে ঠাট্টা করত ?

১৩। মার্কো পোলোর বাবা ও কাকার নাম কি ?

১৪। মার্কো পোলো তাঁর ভ্রমণকাহিনী কাকে বলেছিলেন ?

১৫। কুবলাই খান কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন ?

১৬। মার্কো পোলো দেশে ফেরার সময়ে জলপথে ফিরেছিলেন কেন ?

১৭। কোন্ চীনা সম্রাটের সময়ে হিউয়েন সাং ভারতে এসেছিলেন ?

১৮। কোন্ রাজবংশের সময়ে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রথম প্রচারিত হয়েছিল ?

মধ্যযুগে জাপান

১. মধ্যযুগের গোড়ায় জাপানের সমাজ ও অর্থনীতি

জাপান : চীনের উত্তর-পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান অবস্থিত। চারটি বড় ও কয়েক হাজার ছোট দ্বীপ নিয়ে এই দেশ গঠিত। বড় দ্বীপগুলি হ'ল উত্তরে হোক্কাইডো, মধ্যে হন্‌শু এবং দক্ষিণে শিকোক্কু ও কিউশু। সবচেয়ে বড় দ্বীপ হন্‌শু।

প্রাচীনকালে জাপান ইয়ামাটো নামে পরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের এক তাং সম্রাট জাপানকে তাইনিইহ্ পুংকুক বা সূর্যোদয়ের সুমহান্ রাজ্য আখ্যা দিয়েছিলেন। ঐ আখ্যাটি জাপ সম্রাটের খুব ভালো লেগেছিল। তাই জাপানীরা তখন থেকেই নিজেদের দেশকে দাই নিপ্পন বা সূর্যোদয়ের দেশ

বলতে থাকে। এই দাই নিপ্পন কথা থেকেই জাপান শব্দটির উৎপত্তি।

জাপানের অধিবাসী ঃ প্রাচীনকালে এখানে আইনু নামে এক উপজাতির লোক বাস করত। এদের মুখের আদল কিছুটা আর্যদের মতো, আর্যদের মতোই এদের শরীরে লোমের আধিক্য এবং এদের রং আর্যদের মতোই ফর্সা। পরে সম্ভবত মঙ্গোলীয় জাতীগোষ্ঠীর লোক এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও কিছু লোক আসে। এইসব জাতির মিলন ও মিশ্রণের ফলেই জাপানী জাতির উদ্ভব হয়েছে। জাপানীরা মূলত মঙ্গোলীয় জাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

মধ্যযুগে জাপানী সমাজ ও অর্থনীতি ঃ জাপান দ্বীপময় ও পর্বতময় দেশ। জাপানের সমুদ্রপোকূল এত দীর্ঘ যে, তেমনটি পৃথিবীর আর কোনও দেশের নয়। তাই সমুদ্রে মৎস্য-শিকার জাপানীদের একটি প্রধান জীবিকা। জাপান অসংখ্য পর্বতে পূর্ণ হ'লেও পর্বতগুলির পাদদেশে ও উপত্যকায় উর্বর সমভূমির অভাব নেই। ঐসব উর্বর সমভূমি পার্বত্য নদী ও ঝরনার জলে বিধৌত হয়। তাই জাপানীদের অন্যতম প্রধান জীবিকা কৃষি। ধান, আলু, শাক-সবজি, ফল, তুলো প্রচুর পরিমাণে জাপানী কৃষকরা উৎপন্ন করে। তবে তুলোর চাষ সম্ভবত মধ্যযুগের মাঝামাঝি অষ্টম শতাব্দীতে জাপানে প্রথম এসেছিল। জাপানের প্রাচীন ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে একদল ভারতীয় নাবিক জাহাজডুবি থেকে বেঁচে জাপানে আশ্রয় নেন। তাঁদের কাছে তুলার বীজ ছিল। তাঁরাই জাপানে তুলোর চাষ প্রবর্তন করেন।

জাপানে তুষারমণ্ডিত আগ্নেয়গিরি ফুজিয়ামা অবস্থিত। তাই জাপানে যখন-তখন ভূমিকম্প হয়। জাপানীরা ভূমিকম্পকে ভয়ের চোখে দেখে না। বরং ভূমিকম্প নিয়ে তারা ঠাট্টা-তামাসা করে। আমাদের হিন্দুপুরাণে বলা হয়, পাতালে বাসুকি নাগ তাঁর ফণা নাড়লে ভূমিকম্প হয়। জাপানী পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়,

পৃথিবীর তলায় একটি বিরাট মাগুর-জাতীয় মাছ আছে। সেই মাছ তার গা নাড়লে ভূমিকম্প হয়। জাপানে যখন-তখন ভূমিকম্প হয় বলে জাপানীরা মাটি, ইট, পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরী না ক'রে কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরী করে। বাড়িগুলি চার-পাঁচ-তলাও হয়।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে তাং-সম্রাটদের যুগে চীনের সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। অন্য দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণের ক্ষমতা জাপানের অসাধারণ। চীনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে জাপান শিল্পে ও শ্রমশিল্পে দ্রুত উন্নতি করে। চীনের রাজধানী শিয়ান-ফুর অনুকরণে জাপানীরা তাদের রাজধানী নারা-কে সুসজ্জিত ও সুসমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করে।

চীন ও কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটায় কেবল শিল্পে ও শ্রমশিল্পে নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতিতেও জাপান যথেষ্ট অগ্রসর হয়। জাপানী ভাষায় বহু গ্রন্থাদি রচিত হ'তে থাকে এবং চীনা লিপির অনুকরণে জাপানে লিপি ও মুদ্রণব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৯১ খ্রীঃ অঃ) চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জাপানে চায়ের বীজ আনেন এবং চায়ের চাষ প্রবর্তন করেন। জাপানে চায়ের ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে। জাপানে চা-পান একটি পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। জাপানীদের গৃহে চা-পানের জন্য একটি ক'রে ক্ষুদ্র সুপরিচ্ছন্ন কুটির থাকে, সেটিকে জাপানীরা পূজোর ঘরের মতো পবিত্র মনে করে।

গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্র : গোড়ার দিকে জাপানের অধিবাসীরা বহু ক্ল্যান বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এইসব গোষ্ঠীর পরিচালনা করত এক-একজন গোষ্ঠীপতি। গোষ্ঠীপতিরা ক্রমেই সামন্তপ্রভুতে পরিণত হয়েছিল। এইসব গোষ্ঠীপতি বা সামন্ত-প্রভুদের মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ ও যুদ্ধ ঘটায় দেশে শান্তি ও ঐক্য ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তেন্নো নামে একটি গোষ্ঠী প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। এইভাবে জাপানে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল।

জাপানের প্রাচীন ধর্ম ঃ প্রাচীনকালে জাপানীরা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নানা দেবদেবীরূপে কল্পনা ক'রে তাদের পূজো করত। তাদের এই ধর্মের নাম শিন্‌টো বা দেব-মার্গ (Way of gods). শিন্‌টো ধর্মে দেবদেবীদের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের উপাসনাও প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, চীন ও কোরিয়া থেকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। এইভাবে তখন থেকে জাপানে শিন্‌টো ও বৌদ্ধধর্ম প্রধান দুটি ধর্মরূপে প্রচলিত থাকে।

জাপানের পৌরাণিক কাহিনী থেকে প্রাচীন জাপানের রাজনৈতিক বিকাশের ধারা কিছুটা অনুমান করা যায়। জাপানীরা জার্মান উপজাতিসমূহের মতো সূর্যকে দেবীরূপে কল্পনা করেছিল। সূর্যদেবী আমাতেরাসু-কে একবার তাঁর ভাই পবনদেবতা সুসা-নো-ওয়ো অপমান করলে সূর্যদেবী ক্ষোভে ও দুঃখে পাতালে গিয়ে আত্মগোপন করেন। ফলে পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে আসে। তখন দেবতারা সূর্যদেবীকে পাতাল থেকে বার ক'রে আনবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করেন। কিন্তু সূর্যদেবী তাতে কর্ণপাত করেন না। শেষে দেবতারা তাঁকে বলেন যে, তাঁর চেয়েও শক্তিশালিনী এক দেবীর সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন, সুতরাং সূর্যদেবী ফিরে না এলেও কোন ক্ষতি হবে না। তাঁরা সূর্যদেবীর সামনে একটি বিশাল আয়না তুলে ধরেন। সূর্যদেবী আয়নার মধ্যে নিজের উদ্ভাসিত জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে দেবতাদের কথা বিশ্বাস করেন এবং পাতাল থেকে বাইরে আসেন। আবার পৃথিবী আলোকিত হয়। ঐ সময়ে পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছিল। তাই দেবতারা পৃথিবীতে (অর্থাৎ জাপানে) শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সূর্যদেবীর পৌত্র জিম্মুকে জাপানের সম্রাট ক'রে পাঠান।

মিকাডো ঃ জিম্মু তেন্নো নামেও জিম্মু পরিচিত। তা থেকে বোঝা যায়, জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মু ছিলেন তেন্নো গোষ্ঠীর দলপতি। এই জিম্মু তেন্নোর বংশধররাই অবিচ্ছিন্নভাবে বংশ-পরম্পরায় আজ পর্যন্ত জাপানে রাজত্ব করছেন। পৃথিবীর কোনও

দেশে এক রাজবংশ এমন সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেননি। জাপানের সম্রাটকে বলা হয় মিকাডো। জাপানীরা বিশ্বাস করে মিকাডো দেবতার বংশধর। তাই মিকাডোর প্রতি আনুগত্য জাপানীদের ধর্মেরও অঙ্গ।

২. জাপানের সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য

নামমাত্র সম্রাট : জাপানের মিকাডো বা সম্রাট দেবতার বংশধর ব'লে অশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সার্বভৌমত্ব সকলেই স্বীকার করত। কিন্তু অধিকাংশ সময় তাঁকে কোন-না-কোন ক্ষমতাশালী সামন্ত-পরিবারের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হ'ত। তাঁর অধিকার প্রধান পুরোহিতের অধিকারে সীমাবদ্ধ থাকত। তবে মিকাডোকে সিংহাসনচ্যুত করার কথা কেউ কল্পনাও করত না। সকলেই চাইত মিকাডোকে নিজের বশে রাখতে।

একসময় ফুজিওয়ারা পরিবার খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা মিকাডোকে হাতের পুতুল ক'রে সারা দেশ শাসন করত। এইভাবে অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকা যখন অসহ্য হ'ত, তখন অনেক মিকাডো সিংহাসন ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে বৌদ্ধ মঠে চলে যেতেন এবং তাঁর পুত্র তখন মিকাডো হতেন। ওঁরা সন্ন্যাসী-সম্রাট নামে পরিচিত ছিলেন। সন্ন্যাসী-সম্রাটরা প্রায়ই তাঁদের উত্তরাধিকারীদের পরামর্শ দিয়ে রাজকার্যে পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতেন। সম্রাটরা সন্ন্যাসী হয়ে বৌদ্ধমঠে যোগ দেওয়ায় বৌদ্ধমঠগুলি দেশে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

শোগুন-শাসনের সূচনা : ফুজিওয়ারা পরিবার নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেশে জমিদার-শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল। এইসব জমিদার বা সামন্তদের বলা হ'ত দাইমিও। দাইমিওদের ওপর থাকত রাজস্ব আদায়ের ভার। দাইমিওরা প্রজাদের ওপর অত্যাচার করত এবং অনেক দাইমিও-পরিবার কালক্রমে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠত। এইরকম দুটি প্রবল দাইমিও পরিবার ছিল টাইরা ও মিনোমটো পরিবার।

মিকাডো নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য টাইরা ও মিনোমটো পরিবারের সাহায্য নেন। টাইরা ও মিনোমটো পরিবার একযোগে আক্রমণ ক'রে ফুজিওয়ারা পরিবারকে বিধ্বস্ত করে। কিন্তু এখন শাসনকর্তৃত্ব নিয়ে টাইরা ও মিনোমটো পরিবারের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে টাইরা পরিবার জয়লাভ করে এবং নিজেদের কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করার জন্য মিনোমটো পরিবারের সকলকে হত্যা করে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে মিনোমটো পরিবারের একটি বারো বছরের বালক রক্ষা পায়। এই বালকের নাম ইয়োরিটমো।

বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ইয়োরিটমো টাইরা পরিবারের প্রবলতম শত্রুরূপে দেখা দেন। ইয়োরিটমো টাইরাদের রাজধানী কিওটো থেকে বিতাড়িত করেন এবং একটি নৌযুদ্ধে তাদের ধ্বংস করেন। ইয়োরিটমো এখন জাপানে সর্বাধিক প্রতাপশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। মিকাডো তাঁকে **সেই-ই-তাই শোগুন** বা **বর্বরদমনকারী** মহাসেনাপতি আখ্যা দেন। ইয়োরিটমোর হস্তে মিকাডো দেশ-শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেন (১১৯২ খ্রীঃ অঃ)। শোগুন শব্দের অর্থ সেনাপতি। এইভাবে জাপানে শোগুন-শাসন বা সেনাপতিদের শাসন শুরু হয়।

৩. শোগুন শাসনের যুগ : সামুরাই : বুশিডো

কামাকুরা শোগুনদের শাসন : মিকাডো থাকতেন রাজধানী কিওটোতে। রাজধানীতে থাকলে পাছে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত হয়ে পড়েন, সেজন্য ইয়োরিটমো কামাকুরাতে তাঁর সামরিক রাজধানী স্থাপন করেন। শোগুন-পদ বংশগত হয়ে পড়ে। ইয়োরিটমোর বংশধররা কামাকুরা থেকে দেশ শাসন করতেন। তাই তাঁদের শাসনকালকে কামাকুরা শোগুনদের শাসনকাল বলা হয়।

শোগুন-শাসনের অবসান : পরে অন্যান্য কয়েকটি বংশও শোগুনরূপে দেশ শাসন করেন। তাঁরা তাঁদের সামরিক রাজধানী

টোকিওতে স্থানান্তরিত করেন। এইভাবে পরে কিওটোর পরিবর্তে টোকিও জাপানের রাজধানী হয়।

মিকাডো সম্রাট হ'লেও শোগুনরা দেশের প্রকৃত শাসক ছিলেন। জাপানে সাড়ে ছ শ বছরেরও বেশি (১১৯২—১৮৬৭) শোগুন-শাসন ছিল। কিওটোতে মিকাডো নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় থাকতেন।

জাপানে এই সুদীর্ঘকাল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। সামন্তপ্রভুরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ করতেন। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। শোগুন-শাসনকালে জাপান বহির্জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হয়নি।

সামুরাই শ্রেণী ঃ শোগুনদের শাসনকালে একশ্রেণীর লোক যুদ্ধকেই পেশারূপে গ্রহণ করেছিল। এদের বলা হ'ত সামুরাই। এরা কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অন্য কোন বৃত্তিতে আত্ম-নিয়োগ করত না। এরা ছিল অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ও কলহপ্রিয়। এরা প্রায়ই দ্বৈতযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ত, অনেক সময়ে মত্ত অবস্থায় হাঙ্গামা বাধাতো। সমাজে এদের প্রতাপ ও মর্যাদা ছিল অপরিসীম। এরা সামন্ত-প্রভুদের অনুগত ছিল এবং তাদের হয়ে যুদ্ধ করত। এইভাবে সামুরাই শ্রেণী একটি অনুৎপাদক ও উৎপীড়ক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। এরা ছিল দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ। সামন্ত-প্রভুরা এদের সাহায্যে জনসাধারণের ওপর অবাধ শাসন ও শোষণ চালাত। সামুরাইদের ভয়ে সাধারণ মানুষ সন্ত্রস্ত থাকত। সামন্ত-প্রভুরা সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত ঘৃণার


মধ্য-যুগের জাপানী যোদ্ধা

চক্ষে দেখত। কোন সামন্ত-প্রভু যখন কোথাও দিয়ে যেত, তখন জনসাধারণকে মাটিতে হাঁটু গেড়ে হেঁটমুণ্ডে বসতে হত। সামন্ত-প্রভুদের প্রতি কেউ বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন করলে সামন্ত প্রভুদের অনুগত সামুরাইরা তাকে কেটে ফেলত।

বুশিডোঃ মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইটদের মতো জাপানের সম্ভ্রান্ত ও সামুরাই শ্রেণী নিজেদের জন্য কতকগুলি রীতিনীতি গ'ড়ে তুলেছিল। এইসব আদর্শ ও রীতিনীতির মধ্যে প্রভুভক্তি, আনুগত্য, বীরত্ব ও আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রধান। এইসব আদর্শ ও রীতি-নীতি বুশিডো নামে পরিচিত। বুশিডো অনুসারে কাপুরুষতা ও অপমান সহ্য করা ছিল অতিশয় লজ্জাজনক ও অগৌরবের। অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটি পবিত্র কর্ম। অপমানিত ব্যক্তি অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে অশক্ত হ'লে সে অপমানকারীর গৃহের সম্মুখে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহয্যে নিজের পেট কেটে আত্মহত্যা করত। এইরূপ আত্মহত্যার নাম হারাকিরি। যার গৃহের সম্মুখে হারাকিরি করা হ'ত, সে সমাজের চক্ষে হেয় হ'ত। এইভাবে আত্মহত্যার দ্বারা অপমানিত ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ করত।

অনুশীলনী

১। জাপানের নাম পূর্বে কি ছিল? জাপান নাম কিভাবে হয়েছে?

২। মধ্যযুগীয় জাপানের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

৩। জাপানের সম্রাটকে কি বলে? জাপানের রাজবংশ সম্পর্কে যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তা লেখ।

৪। শিন্‌টো ধর্ম কি? শিন্‌টো ছাড়া অন্য কোন্ ধর্ম জাপানে প্রচলিত হয়েছিল? ঐ ধর্ম কিভাবে জাপানে প্রচলিত হয়?

৫। ফুজিওয়ারা পরিবার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। জাপানের 'সন্ন্যাসী সম্রাট' কাদের বলা হ'ত?

৭। জাপানে শোগুন-শাসন সম্পর্কে যা জান লেখ।

৮। জাপানে শোগুন-শাসনের সূচনা কিভাবে হয়েছিল?

৯। সামুরাই কাদের বলা হত? তাদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

১০। টীকা লেখ : আমাতেরাসু ; মিকাডো ; ইয়োরিটমো ; দাই নিপ্পন ; সামুরাই ; বুশিডো ; দাইমিও ; কামাকুরা শোগুন ।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন :

১। দাই নিপ্পন কোন্ দেশের নাম ?
২। মধ্যযুগে জাপানে বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আর কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল ?
৩। জাপানের সম্রাটকে কি বলা হয় ?
৪। জাপানের সম্রাটকে কোন্ দেবতার বংশধর বলা হয় ? প্রথম জাপ সম্রাটের নাম কি ?
৫। শোগুন শব্দের অর্থ কি ?
৬। সামুরাই কাদের বলা হ'ত ?
৭। মধ্যযুগে জাপানের রাজধানী কোথায় কোথায় ছিল ?
৮। কামাকুরায় কে রাজধানী স্থাপন করেন ?
৯। কামাকুরা শোগুন কাদের বলা হ'ত ?
১০। টোকিও কিভাবে জাপানের রাজধানী হ'ল ?

মধ্যযুগে ভারত 11

১. ভারতে হূণ আক্রমণ

হূণ আক্রমণের সূচনা : ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের ওপর যখন হূণ আক্রমণ হয়েছিল, তার প্রায় সমসময়েই হূণরা ভারত আক্রমণ করেছিল। ভারতে যে হূনরা আক্রমণ চালিয়েছিল, তারা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত। এই শাখার শাসক-পরিবারের নাম অনুসারে এদের ইয়ে-থা-ও বলা হয়।

এরা যখন প্রথম ভারত আক্রমণ করে, তখন গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত উত্তর ভারতে রাজত্ব করছিলেন। ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে হূণরা ভারত আক্রমণ

করলে স্কন্দগুপ্ত তাদের পরাজিত ক'রে বিতাড়িত করেছিলেন। স্কন্দগুপ্তই ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট।

হূণ-নেতা তোরমান: ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হূণরা পারস্যের সাসানীয়-বংশীয় রাজা ফিরোজকে হত্যা ক'রে কাবুল ও পারস্য অধিকার করে এবং খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বল্‌খে তাদের রাজধানী ছিল। হূণনেতা তোরমান আবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে গুপ্ত সম্রাট ছিলেন সম্ভবত ভানুগুপ্ত। বর্তমান উত্তর-প্রদেশ, রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর সম্ভবত তোরমানের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। তিনি শাকলে (শিয়ালকোটে) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি শেষ বয়সে সম্ভবত জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পাঞ্জাবের চন্দ্রভাগা (চেনাব) নদীর তীরে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

হূননেতা মিহিরকুল: তোরমানের পর তাঁর পুত্র মিহিরকুল বা মিহিরগুল রাজা হন। তিনি সম্ভবত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ও শৈব ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দশপুরের রাজা যশোবর্মণ এবং মগধের গুপ্তরাজা নরসিংহ গুপ্ত বলাদিত্যের যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে মিহিরকুল পরাজিত ও বন্দী হয়েছিলেন। বলাদিত্য তাঁকে মুক্ত ক'রে দিলে তিনি কাশ্মীরে পালিয়ে যান এবং আরো প্রায় পনের বছর রাজত্ব করেন।

ভারতীয় ইতিহাসে হূণদের গুরুত্ব: এর পরেও হূণরা দীর্ঘকাল উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করে। কনৌজরাজ ঈশানবর্মন, থানেশ্বর-রাজ প্রভাকরবর্ধন প্রভৃতিকেও হূণদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। পরে ভারতে হূণজাতি ব'লে কিছু থাকে না। তারা ভারতের মহামানবের সাগরে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীকালের রাজপুতরা এই হূণদেরই বংশধর ব'লে অনেকে মনে করেন। হূণরা ভারতে এসে ভারতীয়দের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। পরে তারা নিজেদের ভারতীয় আর্যদের বংশধর ও ক্ষত্রিয় ব'লে প্রচার করে। মুসলমান

আক্রমণ ও ইসলাম প্রচারের বিরুদ্ধে তারাই প্রবলতম প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলে এবং ভারতীয় ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে।

২. গুপ্তোত্তর খণ্ডিত ভারত

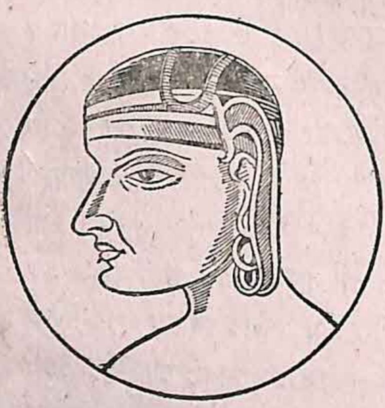
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন: গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের বংশধররা কেউ সুযোগ্য ছিলেন না। তাঁদের দুর্বলতার সুযোগে গুপ্ত সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়েছিলেন। গুপ্ত-বংশীয়রাও মালবে, মগধে, বাংলা-দেশে পৃথক পৃথক রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এইভাবে দেশে বহু ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মালবের দশপুরে **যশোবর্মন্** নামে এক রাজা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে মগধে **মহাসেন গুপ্ত** নামে এক গুপ্তবংশীয় রাজা খুবই প্রভাবশালী ছিলেন। তাঁর রাজ্য পূর্ব-দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে **কনৌজে** মৌখরি-বংশীয় রাজা **ঈশানবর্মন** এবং **থানেশ্বরে** (এখনকার দিল্লীর কাছে) পুষ্যভূতিবংশীয় রাজা **প্রভাকরবর্ধন** খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। মালবে গুপ্তবংশীয় এবং কামরূপে (আসামে) বর্মন্-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করছিলেন।

৩. মহারাজ হর্ষবর্ধন

উত্তর ভারতীয় প্রধান রাজ্যসমূহের দ্বন্দ্ব: ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর-ভারতে চারটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল—থানেশ্বর, কনৌজ, মালব এবং গৌড়-মগধ। থানেশ্বরের রাজা ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজ্যের পূর্বে অবস্থিত কনৌজের মৌখরিবংশীয় রাজাদের শত্রুতা ছিল। কিন্তু প্রভাকরবর্ধন তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীকে কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় এই দুই রাজ্যের মধ্যে মৈত্রী গ'ড়ে ওঠে। থানেশ্বর ও কনৌজের দক্ষিণে ছিল মালব রাজ্য। থানেশ্বর ও কনৌজের মধ্যে মৈত্রী হওয়ায়

মালবরাজ দেবগুপ্ত ভীত হন। কনৌজের পূর্বদিকে ছিল মগধ-গৌড় রাজ্য। এর রাজা ছিলেন মহাবীর শশাঙ্ক। থানেশ্বর ও কনৌজের মৈত্রীতে তাঁরও ভয়ের কারণ ছিল। তাই মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্ক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হলেন।

এই সময়ে থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হ'লে তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজ্যবর্ধন রাজা হলেন। এই সুযোগে দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক মিলিতভাবে কনৌজ আক্রমণ করলেন। দেবগুপ্তের হস্তে কনৌজের গ্রহবর্মন নিহত হলেন এবং তার স্ত্রী রাজ্যশ্রী হলেন কারাগারে বন্দিনী। এই সংবাদ পেয়ে রাজ্যবর্ধন দ্রুত দেবগুপ্ত ও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দেবগুপ্ত তাঁর হস্তে পরাজিত ও নিহত হলেন, কিন্তু শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করলেন। কনৌজের রানী রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে বিন্ধ্যপর্বতে পালিয়ে গেলেন।

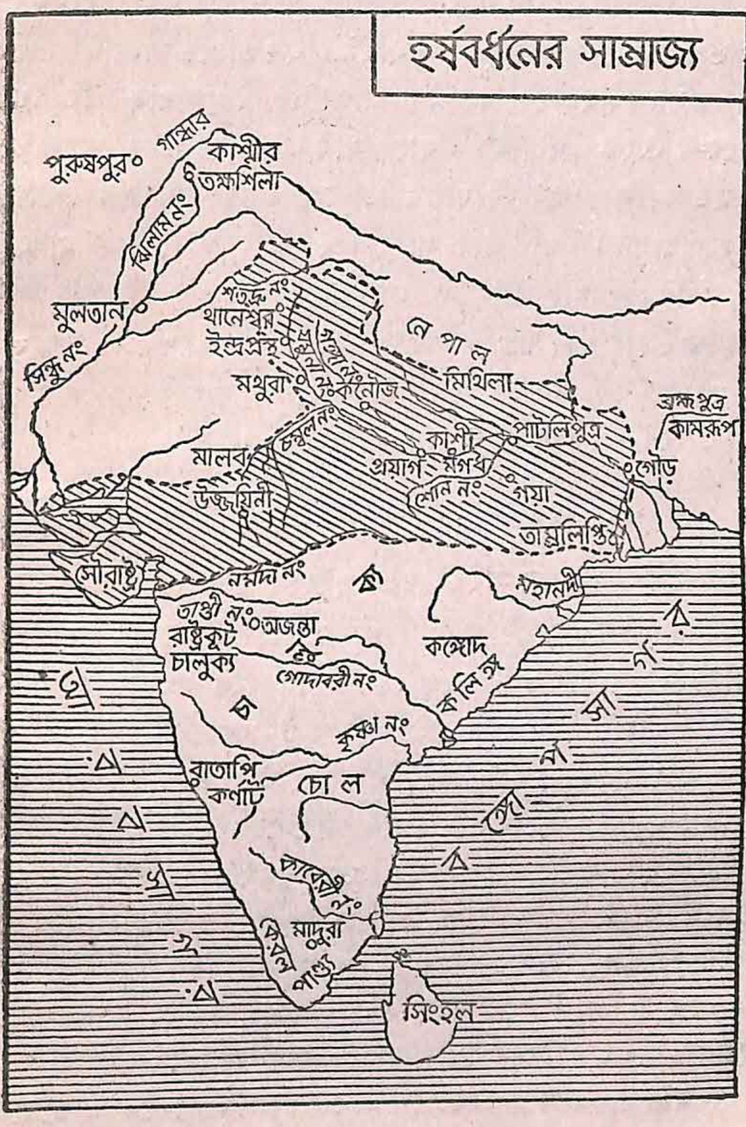


মহারাজ হর্ষবর্ধন

ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের সূচনা : রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হ'লে তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হলেন। কনৌজের সিংহাসন শূন্য থাকায় কনৌজের অমাত্যরা হর্ষবর্ধনকেই কনৌজের রাজা করলেন। এইভাবে থানেশ্বর ও কনৌজ যুক্ত হল। উত্তর-ভারতে পুনরায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা গেল।

সম্ভবত এই ঘটনা ঘটেছিল ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে। কারণ, ঐ সময় থেকেই হর্ষাব্দ গণনা করা হয়। এখন হর্ষবর্ধন তাঁর ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে সমুচিত শাস্তি দিতে প্রস্তুত হলেন। তিনি গৌড়ের পূর্বদিকে অবস্থিত কামরূপ রাজ্যের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। তারপর তাঁরা একযোগে পূর্ব ও পশ্চিম থেকে শশাঙ্ককে

আক্রমণ করলেন। শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণ তাঁর



রাজ্য জয় ক'রে নিলেন। মগধ ও উড়িষ্যার কতকাংশ হর্ষবর্ধনের অধিকারভুক্ত হ'ল। ভাস্করবর্মণ গৌড় অধিকার করলেন।

হর্ষের সাম্রাজ্য : এইভাবে হর্ষবর্ধন এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন। কামরূপের ভাস্করবর্মণ, বল্লভীর ধ্রুবসেন, জলন্ধরের উদিত, মালবের মাধবগুপ্ত প্রভৃতি রাজারা তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার ক'রে চলতেন। কিন্তু ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাতাপির চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে পরাজিত ক'রে দক্ষিণ ভারতে তাঁর অগ্রগতি প্রতিহত করেন হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই তাঁর সার্বভৌমত্ব উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি ছিলেন কেবল উত্তরাপথনাথ।

কিন্তু হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৬৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হ'লে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। আবার উত্তর ভারতে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়।

৪. হিউয়েন সাং ও তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত

ভারতে হিউয়েন সাং : যখন হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে রাজত্ব করছিলেন, তখন চীনা বৌদ্ধাচার্য ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতে এসেছিলেন। তিনি ৬৩০ থেকে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে পর্যটন করেছিলেন। তিনি দু বছর নালন্দায় পড়াশুনাও করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে তৎকালীন ভারত সম্পর্কে নানা কথা জানা গেছে।

হর্ষবর্ধনের কথা : তিনি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে হর্ষবর্ধনের বীরত্ব, ধর্মপ্রাণতা, দানশীলতা ও শাসননৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। হর্ষবর্ধন কনৌজে যে মহামোক্ষপরিষদ্ (ধর্ম সম্মেলন) ডেকেছিলেন এবং প্রতি চার বছর অন্তর প্রয়াগে (এলাহাবাদ) যে মহামেলার অনুষ্ঠান করতেন, হিউয়েন সাং তারও বিবরণ রেখে গেছেন।

কনৌজ ও অন্যান্য শহরের কথা : তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ ঐ সময় পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করেছিল। দেশে অসংখ্য শহর ছিল। সেগুলি ছিল

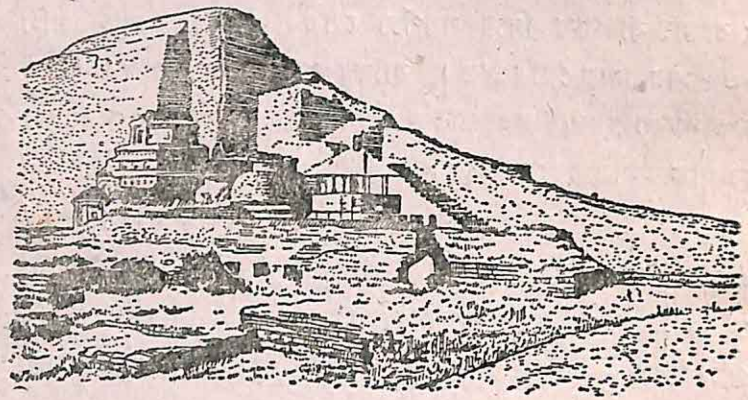
চতুষ্কোণ ও প্রাচীর-বেষ্টিত। রাস্তাগুলি ছিল সরু ও আঁকাবাঁকা। রাজপথের দুধারে থাকত দোকান ও সরাইখানা। কশাই, জল্লাদ, মেথর, জেলে ও অভিনেতাদের বাড়িগুলি থাকত শহরের বাইরে। তাদের বাড়ির গায়ে পেশা-সূচক চিহ্ন থাকত। তারা অস্পৃশ্য ছিল এবং রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে সন্তর্পণে চলত। শহরের প্রাচীরগুলি ইট ও পাথর দিয়ে তৈরি হ'ত। বাড়ির কড়ি-বরগায় সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও নকশা খোদাই করা থাকত। কপাট, জানালা ও দেওয়ালে আঁকা থাকত নানারকমের ছবি।

বেশভূষার কথা ঃ ভারতবাসীরা ঐ সময়ে সেলাই-করা পোশাক পরত না। সাদারঙের পোশাক তারা ভালোবাসত। মাথার উপরের চুলগুলি জটা বা বেণীর মতো ক'রে মাথার উপর বাঁধত। বাকি চুলগুলি কাঁধের উপর লুটিয়ে পড়ত। ভারতীয়রা মাথায় ফুলের মালা ও গলায় হার পরতে ভালোবাসত।

ভারতীয় সমাজ ঃ দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা আগের চেয়ে কমে গিয়েছিল। তবু দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল। দেশে অসংখ্য মন্দির ছিল। হিন্দুধর্ম বেশ প্রবল ছিল। দেশে জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার কঠোরতা ছিল। ভারতীয়রা সত্যবাদী ও সৎ ছিলেন, তাঁরা সত্যরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তবে দেশে দস্যুতস্করের উপদ্রব ছিল। তিনি নিজেও কয়েকবার দস্যুহস্তে পড়েছিলেন। অপরাধীদের শাস্তির কঠোর ব্যবস্থা ছিল। অপরাধীর নাক, কান ও পা কেটে ফেলা হ'ত।

নালন্দা ঃ হিউয়েন সাং নালন্দা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও লিখে গেছেন। পাটনা জেলার বড়গাঁওয়ে এই বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। হিউয়েন সাং বলেছেন, ভারতে ঐসময় অনেক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, কিন্তু সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল নালন্দা। সেখানে দেশবিদেশ থেকে অসংখ্য ছাত্র পড়তে আসত। সেখানে কেবল বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র পড়ানো হ'ত না, বেদ, ব্যাকরণ, ন্যায়, গণিত, আয়ুর্বেদ প্রভৃতিও

শেখানো হ'ত। ঐসময় বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়াশুনো করত। তাদের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা ছিল। ১৮০টি গ্রামের আয় থেকে এই বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহ



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

হ'ত। হিউয়েন সাং নালন্দায় একটি ৮০ ফুট উচ্চ তাম্রনির্মিত বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারত সম্পর্কেও অনেক কথা লিখেছেন।

৫. হর্ষোত্তর যুগ

পুনরায় ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের উদ্ভব ঃ হর্ষবর্ধন অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসন অধিকার করলে হর্ষের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে কনৌজে যশোবর্মন নামে এক শক্তিশালী রাজার অভ্যুত্থান হয়। ঐ সময়ে কাশ্মীরেও কর্কোট-বংশীয় রাজারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের হাতে কনৌজরাজ যশোবর্মন পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের পাল ও রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহারবংশীয় রাজারা শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা

ক্রমাগত পরস্পরের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাঁদের উভয়কেই দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাদের আক্রমণের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। এইভাবে উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। পালরাজ ধর্মপাল (আঃ ৭৭০—৮১০) এবং দেবপাল (আঃ ৭১০—৮৫০) উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। পালরাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে গুর্জর-প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল (৮৮৪—৯১০) উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর সাম্রাজ্যকেই উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য বলা চলে। কিন্তু মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর প্রতিহার-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

রাজপুত রাজ্যগুলির উত্থান ঃ গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে রাজপুতানা ও মধ্যভারতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব হয়। এগুলির মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল, চেদী রাজ্যের (মধ্যপ্রদেশ) কলচুরি, মালবের পরমার, গুজরাটের চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি, শাকম্ভরির (রাজপুতানা) চৌহান এবং কনৌজের গাহড়বাল রাজ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় একযোগে মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে উত্তর ভারত তুর্কী মুসলমানদের অধিকারে যায়।

৬. বাংলাদেশ ও মহারাজ শশাঙ্ক

গৌড়ের অভ্যুত্থান ঃ বাংলাদেশ অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি রাজ্য ছিল —এই রাজের নাম গৌড়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড় ও মগধে গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেন গুপ্ত একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। সমগ্র মগধ ও বাংলাদেশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। মহাসেন গুপ্তের মৃত্যুর পর শশাঙ্ক নামে এক বীর গৌড়ের স্বাধীন রাজা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার : শশাঙ্কের পূর্বপুরুষদের পরিচয় কিছু জানা যায় না। রোটাসগড়ে পাহাড়ের গায়ে শ্রীশ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক নাম খোদাই করা আছে। তা থেকে মনে হয়, শশাঙ্ক মহাসেন গুপ্ত বা তাঁর বংশধরের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। পরে তিনি গৌড়ে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে (এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙমাটিতে)। তিনি সমগ্র বাংলাদেশ, মগধ এবং উড়িষ্যা জেলার কঙ্গোদ (গঞ্জাম জেলা) অধিকার ক'রে একটি শক্তিশালী রাজ্য গ'ড়ে তোলেন।

কনৌজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব : তাঁর রাজ্যের পশ্চিমেই কনৌজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে একযোগে কনৌজরাজ গ্রহবর্মন্‌কে আক্রমণ করেন। গ্রহবর্মণের মৃত্যুর পর থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। তাঁর হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন রাজা হয়ে ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে সমুচিত শাস্তিদানের সংকল্প করেন এবং কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে শশাঙ্ককে আক্রমণ করেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় শশাঙ্কের রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হ'লে হর্ষবর্ধন মগধ এবং ভাস্করবর্মন গৌড় অধিকার করেন।

শশাঙ্ক শৈব ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। হিউয়েন সাং লিখেছেন, তিনি বহু বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করেছিলেন এবং বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেছিলেন। ফলে তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছিল এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। হিউয়েন সাংয়ের এই বিবরণ কতখানি সত্য, তা জানা যায়নি।

৭. বাংলাদেশ ও পাল রাজগণ

মাৎস্য ন্যায়ের অবস্থা : শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল, দেশে অরাজকতা ও অশান্তি বিরাজ করছিল। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে, তেমনি বাংলাদেশে ঐ

সময় প্রবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করছিল। তাই দেশের ঐ অবস্থাকে মাৎস্য ন্যায় বলা হয়েছে।

পালবংশের প্রতিষ্ঠা ঃ বাংলাদেশে মাৎস্য ন্যায়ের অবস্থা প্রায় এক শ বৎসর ছিল। অবশেষে অবস্থা নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠলে দেশের প্রধান ব্যক্তিরা গোপাল নামে এক জনপ্রিয় বীরকে দেশের রাজা নির্বাচিত করেন। পালদের একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং পিতা ব্যপট শত্রুদমন ক'রে অমর কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত সারা বাংলাদেশ গোপালের শাসনাধীন হয়েছিল। গোপালের প্রতিষ্ঠিত বংশ **পাল-বংশ** নামে পরিচিত।

ধর্মপাল ঃ গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজা হয়েছিলেন। তিনি মগধ ও কনৌজ জয় করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি উত্তর ভারতে একটি সুবিশাল রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিক্রমশীল উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মতোই পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। ধর্মপাল নিজের নাম (বিক্রমশীল) অনুসারে বিক্রমশীলা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। দীর্ঘকাল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার সমকক্ষ ছিল। তিনি উত্তরবঙ্গে সোমপুর নামে একটি বিরাট বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেছিলেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ ধ্বংসাবশেষ দেখে বোঝা যায়, এতবড় বৌদ্ধ বিহার ভারতে আর ছিল না। ধর্মপাল বিহারের উদ্দণ্ডপুরেও (ওদন্তপুরে) একটি বিশাল বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেছিলেন। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হলেও পরধর্মদ্বেষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণরা বংশপরম্পরায় পাল রাজাদের মন্ত্রী ছিলেন। ধর্মপাল সম্ভবত ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

দেবপাল : ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল রাজা হন। তিনি পিতৃরাজ্যকে আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন। প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রায় ৩৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পালবংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাহলেও প্রায় আরো তিন শ বছর পাল রাজারা গৌড়ে ও মগধে রাজত্ব করেছিলেন।

৮. বাংলার সেন রাজারা

সেন বংশের প্রতিষ্ঠা : দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সেন রাজারা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের লোক। তাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হওয়ায় 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এই বংশের হেমন্ত সেন বাংলাদেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র বিজয় সেনের সময়ে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে সেন রাজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন রাজা হন (১১৫৮—১১৭৯)। সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু। বল্লাল সেন বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ক'রে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি সম্ভবত মগধের পালবংশীয় রাজাকে পরাজিত ক'রে মগধ অধিকার করেছিলেন। পিতার জীবদ্দশায় তিনি মিথিলাও অধিকার করেছিলেন। তিনি কেবল বীর ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি। তিনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর বিশেষ প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মণ সেন : বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন রাজা হন। পিতার যুদ্ধগুলিতে সেনাপতিরূপে তিনি অশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলন। তিনিই সম্ভবত পালবংশীয় কোন রাজাকে

পরাজিত ক'রে গৌড় অধিকার করেছিলেন এবং নিজের নাম অনুসারে গৌড়ের নাম দিয়েছিলেন লক্ষ্মণাবতী।

লক্ষ্মণ সেনও কবি ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি তাঁর বাবার অসমাপ্ত কাব্য অদ্ভুতসাগরের রচনা শেষ করেছিলেন। তাঁর রাজসভায় জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতিধর, শরণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ ছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি।

তাঁর রাজত্বকালেই মুসলমান তুর্কীরা দিল্লী অধিকার করেছিল। তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং নদীয়ায় বাস করছিলেন। এই সময়ে তুর্কী সেনাপতি ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খলজি অকস্মাৎ নদীয়া আক্রমণ করলে তিনি নদীয়া ত্যাগ ক'রে পূর্ববঙ্গে চ'লে যান। সেখানে তিনি আরও চার বছর রাজত্ব করেন। অল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে যায়। লক্ষ্মণসেন ভীরু বা কাপুরুষ ছিলেন না। অষ্টাদশ তুর্কীর নদীয়া-জয়ের কাহিনী সত্য নয়। মুসলিম প্রতিরোধের অক্ষমতার জন্য লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী, সেনাপতি ও অমাত্যরাই দায়ী ছিলেন।

৯. পাল ও সেন আমলে বাংলা

সমাজঃ পাল ও সেন রাজারা বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে চার শ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ঐ সময়ে সমাজে নিশ্চয় নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছিল। তবে বাংলাদেশের সমাজ কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য ছিল ভাত, মাছ-মাংস, শাক-সবজি, দুধ, ঘি, ছানা-ক্ষীর, পায়স ও ফলমূল। ব্রাহ্মণরাও আমিষ খেতেন। পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে ঐ যুগের বাঙ্গালীরা কি রকম বেশভূষা ব্যবহার করতেন, তা কিছুটা বোঝা যায়। পুরুষরা মালকোচা দিয়ে খাটো ধুতি পরতেন, তা হাঁটুর নীচে নামত না। মেয়েরা শাড়ি পরত। পুরুষরা উত্তরীয় ও মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করত। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলংকারপ্রিয়

ছিল। শাঁখা মেয়েদের প্রিয় ছিল। পুরুষরা জুতো, কাঠের খড়ম ও ছাতা ব্যবহার করত। কুস্তি ও নৃত্যগীতেও বাঙালীর সুনাম ছিল। পাশা ও দাবা খেলা বাঙ্গালীর প্রিয় ছিল।

বাঙ্গালীরা কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে খুবই উন্নত ছিল।

হিন্দু ও বৌদ্ধরা পাশাপাশি বাস করত। ধর্মের জন্য কেউ কাউকে ঘৃণা করত না। মহাযান বৌদ্ধধর্মই বাংলাদেশে প্রবল ছিল। সহজযান, বজ্রযান প্রভৃতি নানা মতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও ছিল। হিন্দুরা নানা দেবদেবীর পূজো করত। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কার্তিকেয় ও সূর্য তাদের প্রধান উপাস্য ছিলেন।

বাংলাদেশ শিল্পসাহিত্যেও খুবই উন্নত ছিল। পাল যুগেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হ'লেও সংস্কৃতই ছিল সাহিত্যের ভাষা। বাংলাদেশের সংস্কৃতে কাব্য-রচনা-নীতি গৌড়ী রীতি নামে পরিচিত ছিল। গৌড়ী রীতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রীতি ব'লে গণ্য হ'ত। পাল যুগের একখানি মাত্র কাব্য পাওয়া গেছে—**সন্ধ্যাকর নন্দী** রচিত রামচরিত। এটি পাল রাজা রামপালের জীবনী কাব্য। কিন্তু এমন সুকৌশলে এই কাব্যটি রচিত যে, এটি রামচন্দ্র ও রামপালের উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'তে পারে।

সেনযুগে লেখা বহু কাব্য পাওয়া গেছে। কবি **জয়দেব** রচিত অমর কাব্য গীতগোবিন্দম্ সারা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কবি **ধোয়ী** কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুকরণে লিখেছিলেন তাঁর **পবনদূত** কাব্য। আয়ুর্বেদ-রচয়িতা চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণি দত্ত, দায়ভাগ নামক আইনগ্রন্থ-রচয়িতা **জীমূতবাহন** এবং অতীশ দীপঙ্করের মতো মহামনীষীরাও পাল যুগেই জন্মেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রাসাদ, মন্দির ও মঠগুলি ইঁটে তৈরী হওয়ায় সেগুলি কালক্রমে ধ্বংস হলেও যেসব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তা থেকে ঐ যুগের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কারো সন্দেহ থাকে না। পাল যুগে চিত্রকলারও খুবই উন্নতি হয়েছিল। এই যুগে **ধীমান** ও **বীটপালের** মতো শিল্পীরা জীবিত ছিলেন। মূর্তি-

নির্মাণেও বাংলাদেশ অগ্রণী ছিল। পাল ও সেন যুগে নির্মিত বহু অপরূপ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আজও সকলকে মুগ্ধ করে।

১০. দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ

বাতাপির চালুক্যগণ: ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যবংশীয় রাজা প্রথম পুলকেশী বাতাপিনগরে (এখনকার বিজাপুর জেলার বাদামি) একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর পৌত্র **দ্বিতীয় পুলকেশীর** সময়ে (৬০৯-৬৪২) চালুক্য রাজ্য খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর রাজ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলে উত্তরে নর্মদা নদী থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনিই হর্ষবর্ধনের দক্ষিণ ভারতে অভিযান প্রতিহত করেন। চোল, চের, পাণ্ড্য ও মহীশূরের গঙ্গারাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কাঞ্চীর পল্লব রাজরা। দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর চালুক্যরা সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও দ্বিতীয় পুলকেশীর অন্যতম পুত্র **প্রথম বিক্রমাদিত্যের** সময়ে চালুক্য রাজ্য আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই বংশের **দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যও** খুবই শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশধরদের সময়ে চালুক্য রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চালুক্যদের অধীন এক সামন্তরাজ স্বাধীনতা ঘোষণা ক'রে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে বাতাপির চালুক্যগণের গৌরবময় শাসনকালের অবসান ঘটে।

পল্লবগণ: চালুক্যগণের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত কাঞ্চীরাজ্যের পল্লবরা। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ **সিংহবিষ্ণু** একটি ঐক্যবদ্ধ তামিল রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। পল্লবরাজ **মহেন্দ্রবর্মনকে** চালুক্যরাজ

দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত করেছিলেন। মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহ-বর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত ক'রে এর প্রতিশোধ নেন।

নরসিংহবর্মনের মৃত্যুর পর পল্লবরাজ্য ক্রমেই রাষ্ট্রকূট ও চোল রাজগণের আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষে ৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পল্লব-রাজ্য চোলরাজের অধিকারভুক্ত হয়।

রাষ্ট্রকূটগণঃ বাতাপির চালুক্যগণের পতনের সুযোগে রাষ্ট্রকূটরা দক্ষিণ ভারতে একটি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এই বংশের প্রথম কৃষ্ণ, ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ, তৃতীয় কৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজগণ উত্তর ভারতে অভিযান করেছিলেন। তাঁরা পাল ও গুর্জর-প্রতিহার-বংশীয় রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। কল্যাণীর চালুক্য রাজগণের অভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের পতন ঘটে।

চোলরাজগণঃ দূর দক্ষিণে চোল রাজারাও দশম শতাব্দীতে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। চোলরাজ পরান্তক পল্লব-রাজ্যের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেন। চোলরাজ রাজরাজ চের ও পাণ্ড্য রাজ্য, সিংহলের উত্তরাংশ, লাক্ষা দ্বীপ ও মাল দ্বীপ চোল রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি কল্যাণীর চালুক্যদের পরাজিত করেন। তাঁর রাজ্য এখনকার অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কুর্গ, সিংহলের উত্তরাংশ, লাক্ষা দ্বীপ ও মাল দ্বীপ নিয়ে গঠিত ছিল। তিনি একটি পরাক্রান্ত নৌবাহিনী গ'ড়ে তুলেছিলেন। চোল রাজ্যই একমাত্র ভারতীয় রাজ্য যা নৌশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সমুদ্র শাসন করত।

রাজরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল (আঃ ১০১৬-৪৪) রাজা হন। তাঁর সময়েই চোলরাজ্য শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। তিনি উত্তর ভারতেও অভিযান করেছিলেন এবং গঙ্গানদীর তীরবর্তী অঞ্চল জয় ক'রে গঙ্গাইকোণ্ড উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজধানীর নতুন নাম হয় গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম্।

তাঁর বিশাল নৌবাহিনী সমগ্র সিংহল, নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে।

ঐ সময়ে মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী ও বোর্নিওতে শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের এই রাজ্যের নাম ছিল শ্রীবিজয়। রাজেন্দ্র চোল নৌযুদ্ধে শ্রীবিজয়-রাজ বিজয়োত্তুঙ্গবর্মন্‌কে পরাজিত ক'রে সুমাত্রা, মালয় ও ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জয় করেন। আর কোন ভারতীয় রাজা সমুদ্রপারে এমন বিশাল রাজ্য গ'ড়ে তুলতে সমর্থ হননি।

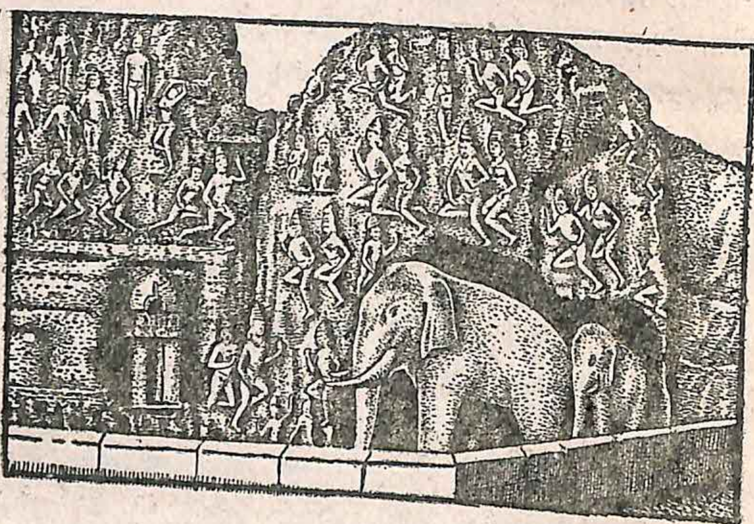
রাজেন্দ্র চোলের বংশধরদের সময়ে চোলরাজ্য ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। সমুদ্রপারের অধিকারগুলি তাঁদের হস্তচ্যুত হয়। রাজেন্দ্র চোলের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে পাণ্ড্য, হোয়সল ও কাকতীয় রাজারা চোল রাজ্যের বিভিন্ন অংশ অধিকার করেন।

১১. দক্ষিণ ভারতীয় রাজাদের শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

সাহিত্য ঃ এই যুগে দক্ষিণ ভারত সাহিত্যেও খুবই উন্নত ছিল। কাঞ্চী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কিরাতার্জুনীয়ম্-প্রণেতা বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন্ নিজে উচ্চ শ্রেণীর কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর **মত্তবিলাসপ্রহসন** একটি বিখ্যাত রচনা।

শিল্পকলা ঃ চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল, সকল রাজারাই শিল্পকলার, বিশেষত স্থাপত্যশিল্পের, উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চালুক্যরাজগণ বাদামি ও পট্টডকলে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার উদ্দেশে বহু সুবিশাল মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ঐ সময়ে পাহাড় কেটে গুহা-মন্দির নির্মাণের রীতি প্রচলিত ছিল। চালুক্যরা বহু গুহা-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অজন্তার বহু বিখ্যাত চিত্র তাঁদের সময়েই অঙ্কিত হয়েছিল।

পল্লবরাও মন্দির ও মূর্তি নির্মাণে অকৃপণভাবে ব্যয় করেছিলেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন্ই প্রথম আস্ত পাহাড় খোদাই ক'রে মন্দির নির্মাণের রীতি চালু করেন। তাঁর পুত্র রাজা নরসিংহবর্মন্ মহাবলিপুরম্ (মামল্লপুরম্) নগর স্থাপন ক'রে সেখানে আস্ত



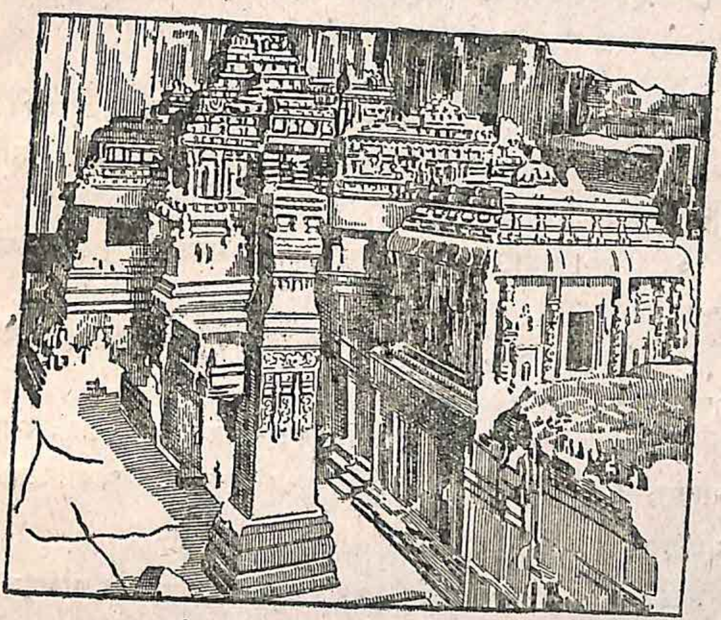
পাহাড় কেটে গঙ্গাবতরণের দৃশ্য—মামল্লপুরম্

পাহাড় কেটে সপ্তরথ নামে বিখ্যাত মন্দিরগুলি নির্মাণ করিয়েছিলেন। পল্লব রাজারা কাঞ্চী, দলবনুর, পল্লবরম্, বল্লম্, পুডুকোট্টাই, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রকূট রাজারাও স্থাপত্য-শিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ ইলোরায় আস্ত পাহাড় কেটে যে অপূর্ব কৈলাসনাথের মন্দির নির্মাণ করান, তা আজও স্থাপত্যশিল্পের এক বিস্ময় হয়ে আছে।

চোল রাজারাও অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁদের নির্মিত তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর শিবের মন্দিরটি ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির। এর উচ্চতা ১৯০ ফুট, এটি চৌদ্দতলায় সমাপ্ত। একটি

সুবিশাল শিলাখণ্ড দিয়ে এর চূড়াটি তৈরী। ঐ সুবিশাল শিলাখণ্ডটি যে কিভাবে অত ওপরে তোলা হয়েছিল, তা রহস্যময়।



কৈলাসনাথের মন্দির—ইলোরা

ঐসব মন্দিরের গাত্রে যেসব অপূর্ব মূর্তি ক্ষোদিত রয়েছে, তা ঐ যুগের ভাস্কর্যশিল্পের অভাবনীয় উৎকর্ষেরই প্রমাণ।

অনুশীলনী

১। যে হূণরা ভারত আক্রমণ করেছিল, তাদের কি বলা হয়? ভারতে প্রথম হূণ আক্রমণকালে কোন্ গুপ্ত সম্রাট রাজত্ব করছিলেন? এই আক্রমণের ফল কি হয়েছিল?

২। তোরমান কে ছিলেন? তাঁর ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কি জান?

৩। মিহিরকুল কে ছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪। ভারতে হূণ আক্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৬। হর্ষবর্ধনের রাজ্যলাভ এবং ভারতে পুনরায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে যা জান লিখ। হর্ষবর্ধন কেবল 'উত্তরাপথনাথ' ছিলেন কেন?

৭। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারত সম্পর্কে কি জানা যায়?

৮। গুর্জর-প্রতিহার ও রাজপুতগণের অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা জান লিখ।

৯। মহারাজ শশাঙ্ক সম্পর্কে যা জান লিখ।

১০। পাল ও সেন শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১১। পাল ও সেন যুগের ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যা জান লিখ।

১২। দক্ষিণ ভারতে বাদামির চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লব রাজগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৩। চোল রাজাদের সামুদ্রিক অভিযান ও সমুদ্রপারে সাম্রাজ্য স্থাপন সম্পর্কে যা জান লিখ।

১৪। চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট ও চোলদের স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কে কি জান?

১৫। টীকা লিখ: শ্বেত হূণ; যশোধর্মণ; শশাঙ্ক; মাৎস্য ন্যায়; ধর্মপাল; নালন্দা; বল্লাল সেন; লক্ষ্মণসেন; দ্বিতীয় পুলকেশী; নরসিংহবর্মণ; রাজেন্দ্রচোল।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। হূণরা কোন্ গুপ্ত সম্রাটের সময়ে প্রথম ভারত আক্রমণ করেছিল?
২। হূণদের যে শাখা ভারত আক্রমণ করেছিল, তাহা কি নামে পরিচিত?
৩। মিহিরকুল কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন?
৪। হর্ষবর্ধনের রাজধানী কোথায় ছিল?
৫। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে কোন্ দক্ষিণ ভারতীয় রাজার যুদ্ধ হয়েছিল?
৬। হর্ষবর্ধনের সময়ে কোন্ চীনা পর্যটক ভারতে এসেছিলেন?
৭। পাহাড় কেটে মন্দির-নির্মাণের রীতি প্রথম কে চালু করেছিলেন?
৮। আস্ত পাহাড় কেটে নির্মিত সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির কোন্‌টি?
৯। ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির কোন্‌টি?
১০। কোন্ ভারতীয় রাজারা সমুদ্রপারে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন?
১১। কোন্ রাজার রাজধানী ছিল গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরম্?
১২। রাজপুতদের পূর্বপুরুষরা কোন্ জাতির লোক ছিলেন মনে হয়?
১৩। কৌলীন্য প্রথা কে প্রবর্তন করেছিলেন?
১৪। লক্ষ্মণসেনের সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কে ছিলেন?
১৫। কোন্ রাজার সময়ে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম আক্রমণ হয়েছিল?

বহির্বিশ্বে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তার ১২

১. মহাযান বৌদ্ধধর্ম

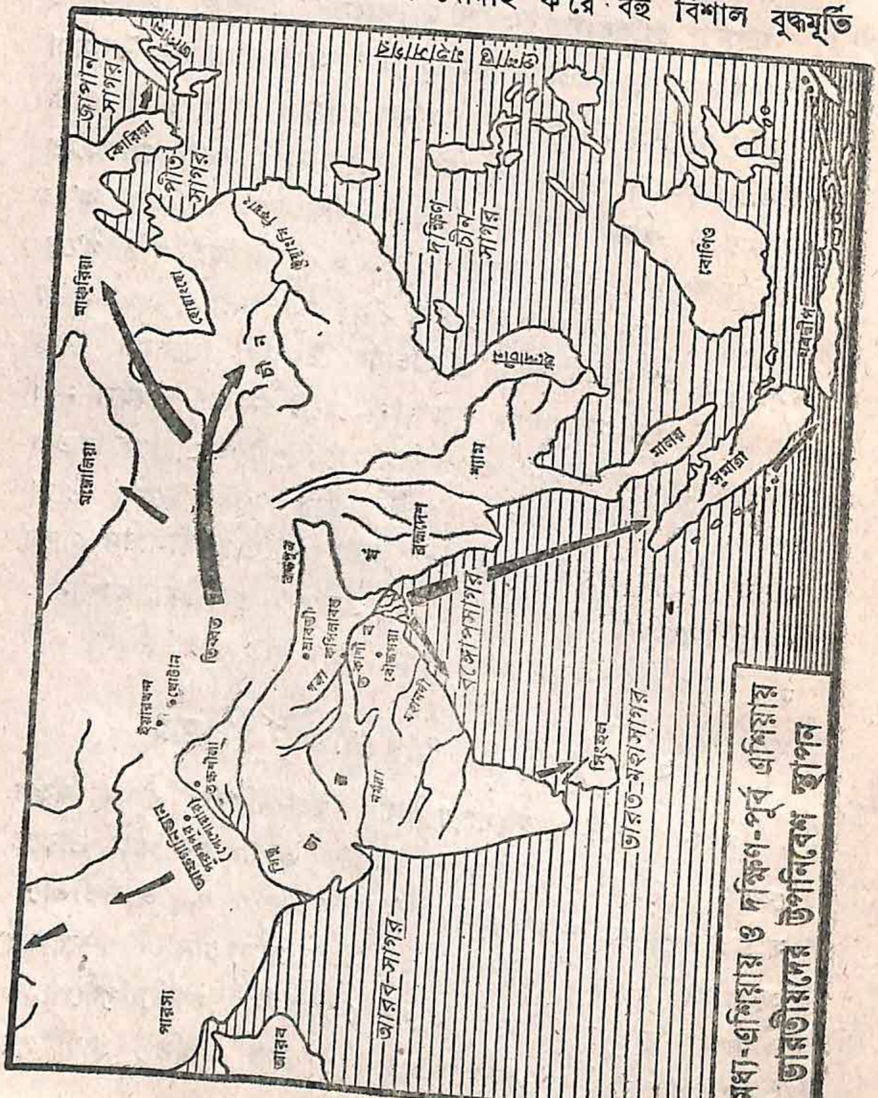
মহাযান বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি : ভারতে দীর্ঘকাল হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পাশাপাশি বর্তমান ছিল। হিন্দুধর্মের দেবদেবীর উপাসনা ও মূর্তিপূজা খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কেবল তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণ বুঝতে পারত না। ফলে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা কমে গিয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার জন্য হিন্দুধর্মের অনুকরণে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি গ'ড়ে সেগুলির আরাধনার রীতি চালু করা হ'ল। এ বিষয়ে কুষাণ আমলে নাগার্জুন, অশ্বঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যরা উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সকলে বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজার আমদানি মেনে নিতে পারলেন না। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম মহাযান ও হীনযান নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেন। যাঁরা মূর্তি নির্মাণ ও তার উপাসনার সমর্থক ছিলেন, তাঁরা মহাযান নামে এবং যাঁরা এর বিরোধী ছিলেন, তাঁরা হীনযান নামে পরিচিত হলেন। মধ্য-এশিয়া, চীন, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে।

২. মধ্য-এশিয়ার পথে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার

মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ : মধ্য-এশিয়ার বল্‌খ্‌ অঞ্চল থেকে বাহ্লীক গ্রীক ও কুষাণরা ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিলেন। কুষাণরাজ কণিষ্কের সাম্রাজ্য চীন ও তিব্বতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর আমলেই মহাযান বৌদ্ধমত প্রবর্তিত হয়েছিল।

তাঁর সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি, মধ্য-এশিয়ায় প্রবেশ করেছিল।

পারস্য, আফগানিস্থান ও কাফিরিস্থান (প্রাচীন নাম কপিশা) বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। হিন্দুকুশ পর্বতের বামিয়েন গিরিপথে যে প্রাচীন রাজ্য ছিল, তা-ও বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে হিন্দুকুশ পর্বতের গা খোদাই ক'রে বহু বিশাল বুদ্ধমূর্তি



মধ্য-এশিয়ায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপন

ও গুহগৃহ তৈরি হয়েছিল। কিছুদিন আগে ওইসব গুহাগৃহ ও বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। গুহাগৃহে বহু সুপ্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির অংশ পাওয়া গেছে।

বামিয়েন গিরিপথ পার হ'লেই মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন বাহ্লীক-রাজ্য বা বলখ্। হিউয়েন সাং যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন এই রাজ্যের নাম ছিল রাজগৃহপুর। তখন এখানে যে বিরাট বৌদ্ধ বিহার ছিল, তার নাম ছিল নবসংঘারাম। নবসংঘারামে অপরূপ বুদ্ধমূর্তি ও প্রায় তুশ ফুট উঁচু বৌদ্ধস্তূপ তিনি দেখেছিলেন।

মধ্য-এশিয়ার খোটান, কাশগর, কারাশর, কুচী, চোক্কুক (ইয়ারকন্দ), নিয়া, ভরুক (ইয়াক-আরিক), তুরফান প্রভৃতি স্থান ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। খোটানের গোশৃঙ্গ ও গোমতী বিহারে বহু ভারতীয় পণ্ডিত বাস করতেন। চীন ও এশিয়ার বহুস্থান থেকে তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসীরা সেখানে আসতেন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায়, সেই সময়ে গোমতী বিহারে তিন হাজারেরও বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। আহারের সময় ঘণ্টাধ্বনি করা হলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিঃশব্দে এসে আসন গ্রহণ ক'রে আহার সমাপ্ত করতেন। প্রতি বৎসর এখানে বুদ্ধের রথযাত্রা হ'ত।

কুচীতেও বহু বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখানে সংস্কৃতে লেখা অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, কুচী রাজ্যের রাজধানীতে শতাধিক বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং পাঁচ হাজারেরও বেশি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। এখানকার সবচেয়ে বড় বিহারটির নাম ছিল আশ্চর্য বিহার। হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, চোক্কুক (ইয়ারকন্দ) বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার কিজিল দরিয়া ও তারিম নদী ঐ সময় সীতা নদী নামে পরিচিত ছিল।

চীনদেশের সীমান্তে তুন-হোয়াং-এ একটি ছোট নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে অজন্তার অনুকরণে প্রায় পাঁচশ গুহাগৃহ ও এক

হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়েছিল। গুহাগৃহগুলি অজন্তার মতোই অপূর্ব চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুশোভিত ছিল। তুন-হোয়াং ছিল বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা তুন-হোয়াং আক্রমণ করলে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিগুলিকে রক্ষা করার জন্য সেগুলিকে একটি গুহায় রেখে পাথর দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে চীনদেশে পালিয়ে যান। ঐসব পুঁথি অক্ষত অবস্থায় এখন পাওয়া গেছে। পুঁথির সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশী।

এই পথেই বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে বিস্তার লাভ করেছিল।

৩. তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগ

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার : সু-প্রাচীন কাল থেকেই হিমালয়ের গিরিপথে ও মধ্য-এশিয়ার পথে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। হিমালয়ের গিরিপথে এবং মধ্য-এশিয়ার পথে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ থাকায় এই পথেই সম্ভবত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করেছিল। তাং যুগে তিব্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কুবলাই খানের সময়ে তিব্বত চীনের শাসনাধীন ছিল। ফলে চীনের পথেও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। এখানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে ও সংস্কারসাধনে ভারতীয়রা বিশেষভাবে অংশ নিয়েছিলেন। এইসব ভারতীয়দের মধ্যে বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান : দক্ষিণবঙ্গের বিক্রমণিপুরে গৌড়ের এক রাজবংশে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল **চন্দ্রগর্ভ**। তাঁর বাবার নাম কল্যাণশ্রী ও মার নাম প্রভাবতী। তিনি প্রথমে বিখ্যাত বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য জেতারি ও রাহুল গুপ্তের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তারপর

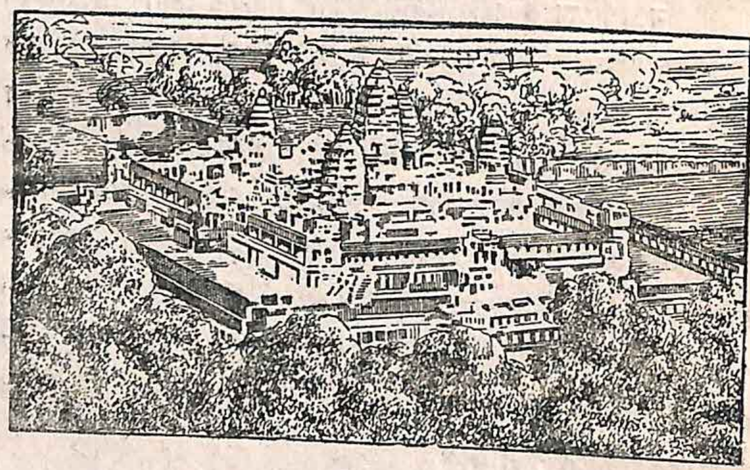
উনিশ বছর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নেন ও বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। ঐ সময় থেকে তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর **শ্রীজ্ঞান**। তারপর তিনি যবদ্বীপে গিয়ে বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে বারো বছর শিক্ষালাভ করেন এবং সিংহলের পথে ভারতে ফিরে আসেন। পালরাজ **নয়পাল** তাঁকে বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্য-পদে নিয়োগ করেন।

এই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মে নানারূপ বিকৃতি দেখা দিয়েছিল। তাই তিব্বতরাজ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তাঁকে তিব্বতে যেতে অনুরোধ করেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত তিব্বতরাজের মৃত্যুকালীন অনুরোধ এড়াতে পারেন না। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও পথক্লেশ হেলায় উপেক্ষা ক'রে তিব্বতে যান এবং সেখানে বৌদ্ধধর্মের আমূল সংস্কার করেন। সেখানে তেরো বছর থেকে তিনি প্রায় দু-শ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তিব্বতে তিনি অতীশ (সর্বশক্তিমান্) নামে অভিহিত হন। আজও তিব্বতীরা তাঁকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

৪. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তার

ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপন : প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশে ও দ্বীপগুলির সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ভারতীয়রা জলপথে ঐসব জায়গায় বাণিজ্য করতে যেতেন। ভারতীয়রা ঐসব জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, রাজ্য-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কৌণ্ডিণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ ইন্দোচীনে একটি ভারতীয় উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। ঐ রাজ্য ফু-নান নামে পরিচিত ছিল। এখনকার কাম্বোডিয়ার উত্তরাংশে কম্বুজ নামে একটি রাজ্য ছিল। কথিত আছে, কম্বু স্বায়ম্ভুব নামে এক ভারতীয় এই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কম্বুজের রাজধানী ছিল এঙ্কোর ঠোম (ওঙ্কার

থাম)। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। কম্বুজের রাজারা ছিলেন হিন্দু। তাঁরা এঙ্কোর ভাট নামে যে বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই মন্দিরটি পর পর সারি সারি সোপানে বেষ্টিত তিনটি উচ্চ মঞ্চের ওপর স্থাপিত। মঞ্চগুলির গায়ে অপরূপ সব মূর্তি ও নকশা খোদাই করা আছে। অসংখ্য চূড়া আছে এই মন্দিরে।



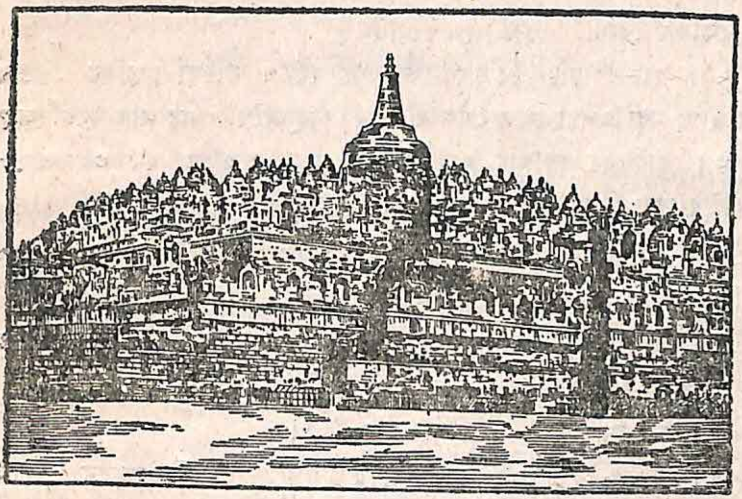
এঙ্কোর ভাট—বিষ্ণু-মন্দির

মন্দিরের মাঝখানের চূড়াটি সবচেয়ে উঁচু, এর উচ্চতা মাটি থেকে ২১৩ ফুট। মন্দিরটির চারদিক পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের বাইরে আছে ৭০০ ফুট চওড়া একটি পরিখা। প্রাচীর থেকে সবচেয়ে নিচের মঞ্চটির দূরত্ব প্রায় সিকি মাইল। এ থেকে মন্দিরটির বিশালতা অনুমান করা যায়।

কম্বুজের পূর্বে আর একটি রাজ্য—নাম চম্পা। এখানেও হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। চম্পাও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি ও বোর্নিওতে অনেকগুলি ভারতীয় রাজ্য ছিল। এইসব স্থান অষ্টম শতাব্দীতে একে একে শ্রীবিজয়

সাম্রাজ্যের অধীন হয়। শৈলেন্দ্র-বংশীয় বৌদ্ধ রাজারা শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য শাসন করতেন। শ্রীবিজয় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। শৈলেন্দ্র-বংশীয় সম্রাটের গুরু ছিলেন বাঙ্গালী



বরবুদুরের বুদ্ধমন্দির যবদ্বীপ

বৌদ্ধাচার্য কুমার ঘোষ। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয়-সম্রাট সংগ্রাম বিজয়োত্তুঙ্গবর্মণকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন।

শৈলেন্দ্র-বংশীয় সম্রাটরা বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে যবদ্বীপের বরবুদুরের বুদ্ধমন্দির বা স্তূপটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। স্তূপটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় পর পর নটি মঞ্চের উপর স্থাপিত। সর্বোচ্চ মঞ্চটির মাঝখানে রয়েছে ঘণ্টাকৃতি স্তূপটি। ওপরের তিনটি মঞ্চের চারদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র স্তূপ। আলিসার গায়ে কুলঙ্গির আকারে অসংখ্য ছোট মন্দির আছে। সেগুলিতেও আছে এক-একটি বৌদ্ধমূর্তি। মঞ্চের চারদিকে যে সোপানাকার আসন আছে, সেগুলিতে অসংখ্য বৌদ্ধ কাহিনী খোদাই করা আছে। মন্দিরটির আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গফুট। বিশালতা, গঠন-সুষমা ও শিল্পকার্যের দিক থেকে এটি ভারতীয় নির্মাণ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অনুশীলনী

১। মহাযান বৌদ্ধমত কি? ঐ মত কবে প্রবর্তিত হয়েছিল? ঐ মত প্রবর্তনের ফলে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল কেন? মহাযান বৌদ্ধ মত কোথায় কোথায় বিস্তার লাভ করেছিল?

২। মধ্য-এশিয়ায় কিভাবে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছিল? মধ্য-এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম কোন্ কোন্ দেশে বিস্তার লাভ করেছিল?

৩। বামিয়েন কোথায় অবস্থিত? এখানে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল, কিভাবে জানা গেছে?

৪। মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কি কি নিদর্শন ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাং দেখেছিলেন?

৫। তুন্-হোয়াং কোথায় অবস্থিত? তুন্-হোয়াংয়ে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্পর্কে যা জান লিখ।

৭। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন সম্পর্কে যা জান লিখ।

৮। কম্বুজ রাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল? এই রাজ্য সম্পর্কে যা জান লিখ।

৯। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে যা জান লিখ।

১০। টীকা লিখঃ রাজগৃহপুর; গোমতী বিহার; বামিয়েন; তুন্-হোয়াং; চম্পা; এঙ্কোর ভাট; এঙ্কোর ঠোম; বরবুদুর; শ্রীবিজয়।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। বামিয়েন কোথায় অবস্থিত? এখানে কি আবিষ্কৃত হয়েছে?

২। তুন্-হোয়াং কোথায় অবস্থিত? এখানে কি আবিষ্কৃত হয়েছে?

৩। এঙ্কোর ভাট কি? এটি কোথায় অবস্থিত?

৪। বরবুদুরের বৌদ্ধমন্দির কোথায় অবস্থিত?

৫। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা কোথায় রাজত্ব করতেন?

৬। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাল্যকালের নাম কি?

৭। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শেষ জীবন কোথায় কেটেছিল?

৮। মধ্য-এশিয়ার পথে কোথায় কোথায় বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল?

৯। কোন্ কোন্ স্থান নিয়ে শ্রীবিজয়-সাম্রাজ্য গঠিত ছিল?

দিল্লী সুলতানি (১২০৬—১৫২৬) ১৩

১. তুর্কী-আফগানদের ভারত-আগমন

ভারতে মুসলিম আক্রমণ ঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। ঐসময়েআরব সেনাপতি মহম্মদ বিন্‌ কাশিম সিন্ধুদেশ অধিকার করেছিলেন (৭১২)। কিন্তু আরবরা ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হ'তে পারেনি। মুসলিম দুনিয়ায় আরবদের প্রাধান্য অধিককাল থাকে না। তুর্কীরা মধ্য-এশিয়া থেকে মিশর পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে। দশম শতাব্দীর শেষভাগে আফগানিস্থানের গজনীতে একটি তুর্কী রাজ্য খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গজনীর সুলতান সবুক্তিগিন পাঞ্জাব পর্যন্ত ভারতীয় অঞ্চল অধিকার করেন।

সবুক্তিগিনের পর তাঁর পুত্র মামুদ সুলতান হন। মামুদ তাঁর একত্রিশ বর্ষব্যাপী শাসনকালের মধ্যে (৯৯৮-১০৩০) সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি বার বার উত্তর-ভারতে আক্রমণ চালিয়ে বহু নগর জনপদ ধ্বংস করেন, অসংখ্য মানুষকে হত্যা ও বন্দী করেন এবং অতুল ধনরত্ন লুণ্ঠন ক'রে গজনীতে নিয়ে যান। সুলতান মামুদ বার বার ভারত আক্রমণ করলেও ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেননি। ভারতের বিপুল ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। মামুদের মৃত্যুর দেড় শ বছরেরও অধিককাল পরে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

ভারতে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য স্থাপন ঃ গজনীর সুলতানরা দুর্বল হয়ে পড়লে আফগানিস্থানে গজনী ও হীরাটের মধ্যস্থলে ঘুর নামে একটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গজনী ঘুর রাজ্যের অধিকারে যায়। ঘুর রাজ্যের সুলতান গিয়াসুদ্দিন মহম্মদের ভাই শিহাবুদ্দিন মহম্মদ গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সুলতান

মামুদের বংশধরকে বিতাড়িত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন (১১৮৬)। ইনিই ভারতের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত।

পাঞ্জাবের পূর্বদিকে ছিল দিল্লী ও আজমীড়ের রাজপুত রাজ্য। এখানে চৌহান-বংশীয় তৃতীয় পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করছিলেন। মহম্মদ ঘুরী তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ তাঁকে পরাজিত করেন (১১৯১)। কিন্তু পর বৎসর মহম্মদ ঘুরী পুনরায় অভিযান করলে পৃথ্বীরাজ তরাইনের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১১৯২)। মহম্মদ ঘুরী আজমীড় অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি গাহড়বাল-বংশীয় রাজপুত রাজা জয়চন্দ্রকে পরাজিত ক'রে কনৌজ অধিকার করেন। তাঁর সেনাপতি কুতবুদ্দিন আইবক হানসি, মীরাট, দিল্লী, রণথম্ভোর, গুজরাট, কালঞ্জর, মহোবা, বদাউন প্রভৃতি অধিকার করেন। আর এক ভাগ্যান্বেষী তুর্কী সেনাপতি ইক্তিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খলজি মগধ ও পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। এইভাবে ভারতে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

দিল্লীর তুর্কী-আফগান সুলতানগণঃ ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন মহম্মদের মৃত্যু হ'লে মহম্মদ ঘুরী সারা ঘুর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই পাঞ্জাবে তিনি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন। মহম্মদ ঘুরী ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সেনাপতিরা ভাগ ক'রে নেন। কুতবুদ্দিন আইবক হন ঘুর সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের অধিকারী। তাঁর রাজধানী হয় দিল্লী। এইভাবে ভারতে দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা হয় (১২০৬)।

কুতবুদ্দিন আইবক ও তাঁর পরবর্তী কয়েকজন সুলতান প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। এঁরা সকলে এক বংশের লোক না হ'লেও তাঁরা দাস-বংশের সুলতান নামে পরিচিত। দাস-বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন ইলতুৎমিস ও গিয়াসুদ্দিন বলবন। এঁরা রাজপুতানা ও আসাম ছাড়া প্রায় সারা উত্তর ভারতে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলেন। এঁরা মঙ্গোল আক্রমণ

প্রতিরোধ ক'রে ভারতকে মঙ্গোলদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। দাস বংশের সুলতানরা ১২০৬ থেকে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দাস-বংশের পতনের পর দিল্লীতে খলজি-বংশীয় সুলতানরা রাজত্ব করেছিলেন। খলজি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন খলজি। তিনি দক্ষিণ ভারতেও তুর্কী-আফগান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। দক্ষিণ ভারতে ঐ সময় দেবগিরির যাদব রাজ্য, বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য, দোরসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য ও মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য প্রধান ছিল। ঐগুলি তিনি জয় করেন। তিনি রাজপুতানার মেবারসহ অনেক রাজপুত রাজ্যও জয় করেন। এইভাবে আসাম ছাড়া প্রায় সারা ভারতে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। তিনি মঙ্গোল আক্রমণও প্রতিরোধ করেন। তিনি রাজ্যশাসনেও দক্ষতার পরিচয় দেন।

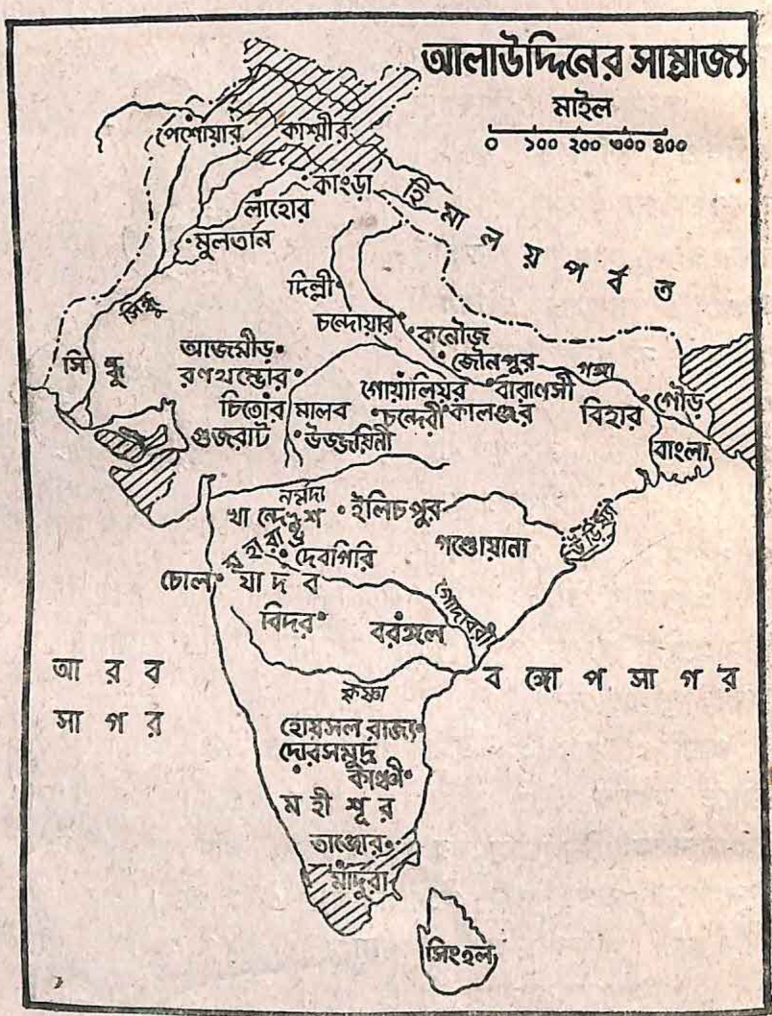


আলাউদ্দিন খলজি

খলজি-বংশীয়রা ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তারপর দিল্লীতে তুঘলুক-বংশীয় সুলতানরা রাজত্ব করেন। এই বংশের সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলুকের অস্থিরচিত্ততা, খামখেয়ালি, নিষ্ঠুরতা ও কুশাসনের ফলে সারা দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। দক্ষিণ ভারতে বামহীন নামে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য এবং বিজয়নগর নামে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে জৌনপুর, মালব, গুজরাট, গোয়ালিয়র, খান্দেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলিও স্বাধীন হয়।

দিল্লী-সুলতানির পতন : দিল্লী-সুলতানির যখন এই রকম অবস্থা, তখন মধ্য-এশিয়ায় তাতার-বীর তৈমুরলঙ্গ দুর্ধর্ষ হয়ে

উঠেছিলেন। সমরখন্দে ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি মধ্য-এশিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করেন এবং



দিল্লী লুণ্ঠন ক'রে অসংখ্য দিল্লীবাসীকে হত্যা করেন। তিনি ক্রমাগত তিন মাস উত্তর-পশ্চিম ভারতে লুণ্ঠন, হত্যা ও ধ্বংস চালিয়ে অগাধ ধনরত্ন নিয়ে ফিরে যান। তিনি উত্তর-পশ্চিম

ভারতে তাঁর বিজিত অঞ্চলের জন্য একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

এর পর দিল্লীতে সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানরা রাজত্ব করতে থাকেন। লোদীরা তুর্কী ছিলেন না, ছিলেন আফগান বা পাঠান। তাঁদের রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লোদী-বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সময়ে মুঘল-বীর বাবর দিল্লী আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী বাবরের হস্তে পরাজিত ও নিহত হ'লে দিল্লীতে তুর্কী-আফগান শাসনের অবসান হয়।


তৈমুরলঙ্গ

২. তুর্কী-আফগান আমলে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ সুলতানি আমলে ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। ভারতের এই অতুলনীয় সম্পদের মূলে ছিল তার কৃষি, কুটিরশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য। কুটিরশিল্পের মধ্যে বয়নশিল্প, রঞ্জন-শিল্প, ধাতুশিল্প ও প্রস্তরশিল্প ছিল প্রধান। কাপড়, কাগজ, ইট, চিনি, অস্ত্রশস্ত্র, পাত্র, পাদুকা, মদ্য ও গন্ধদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হ'ত। বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশ ও গুজরাট ছিল সবচেয়ে উন্নত। সূক্ষ্ম সূতী ও রেশমী বস্ত্র, শস্য, নীল ও আফিম বিদেশে রপ্তানি হ'ত। ঘোড়া, খচ্চর ও ক্রীতদাস এদেশে প্রচুর পরিমাণে আসত। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবন বতুতা বলেছেন, ভারতের মতো জিনিসের এমন কম মূল্য তিনি পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখেননি। দেশে জিতল, তঙ্কা প্রভৃতি দামে মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

সামাজিক অবস্থা ঃ ভারতবর্ষেও মুসলিম বিজেতারা ইসলাম প্রচারে সচেষ্ট ছিল। অনেকেই অত্যাচার-নিপীড়ন, এমন কি

মৃত্যু এড়াবার জন্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অনেকে শাসকশ্রেণীর কৃপা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের অসংখ্য মানুষ অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য ক'রেও হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ছিল। মুসলমানদের জিজিয়া নামে মাথা পিছু কর দিতে হ'ত। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের কর ও রাজস্ব অনেক বেশী ছিল। অনেক সময় হিন্দুদের মন্দির বিধ্বস্ত হ'ত, হিন্দুমন্দিরের ইঁট-পাথর দিয়ে মসজিদ ও প্রাসাদ তৈরি হ'ত।

সমাজে স্ত্রীলোকের অধিকার খুবই সংকুচিত করা হয়েছিল। অবরোধ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। সমাজে নানারকম কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। অট্টালিকাদি নির্মাণের সময়ে সেগুলির ভিত্তিমূলে নররক্ত দেওয়া হ'ত।

হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে ঘৃণা করত। হিন্দুরা মুসলমানদের বলত যবন ও ম্লেচ্ছ। মুসলমানরা হিন্দুদের বলত কাফের ও জিম্মি। কিন্তু পাশাপাশি দীর্ঘকাল বাস করায় হিন্দু ও মুসলমানদের সহিষ্ণুতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কেও শ্রদ্ধা জন্মেছিল। অনেক মুসলমান সুলতান পরধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণু ছিলেন। এ বিষয়ে বাংলার হুসেন শাহ্, কাশ্মীরের জাইনুল আবেদিন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এঁরা অনেকেই সংস্কৃত থেকে দেশীয় ভাষায় হিন্দুধর্মের পুরাণ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়েছিলেন। সুলতান হুসেন শাহের উৎসাহে কবি মালাধর বসু বাংলা ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ ও পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করিয়েছিলেন। জাইনুল আবেদিন মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী পারসী ভাষায় এবং অনেক পারসী ও আরবী ভাষার বই হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন।

এই যুগের ধর্মসাধকরা অনেকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা এবং সকল মানুষকে সমান চক্ষে দেখার আদর্শকে প্রকৃত ধর্ম মনে করতেন। এ

বিষয়ে হিন্দু ভক্তিবাদ ও ইসলামী স্থফীবাদ সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল। ভক্তিবাদীদের মধ্যে রামানন্দ, নামদেব, কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির এবং স্থফীবাদীদের মধ্যে নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও মুইনুদ্দিন চিশ্‌তি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।


কবীর

স্থফী নিজামুদ্দিন আউলিয়া থাকতেন দিল্লীতে, আর মুইনুদ্দিন চিশ্‌তি থাকতেন আজমীড়ে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এঁদের ভক্তি করত।

কবীর কাশীর কাছে এক দরিদ্র তাঁতীর ঘরে জন্মেছিলেন। তাঁর মতে, যিনিই হিন্দুর হরি, তিনিই মুসলমানের আল্লাহ্, যিনিই হিন্দুর রাম, তিনিই মুসলমানের রহিম। হিন্দু-মুসলমান দলে দলে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। এঁরা কবীরপন্থী নামে পরিচিত ছিলেন।


গুরু নানক

পাঞ্জাবের তালবন্দী গ্রামে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে নানকের (১৪৬৯—১৫৩৮) জন্ম হয়েছিল। তিনি হিন্দুর জাতিভেদ ও দেবদেবী মানতেন না। তাঁর মতে, ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। হিন্দু মুসলমান অনেকেই তাঁর শিষ্য হন। তাঁর শিষ্যরা শিখ নামে পরিচিত। শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য।

নদীয়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চৈতন্যদেব (১৪৮৫—১৫৩৩) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। তিনি ২৪ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হন এবং বাংলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারত, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তিনিও জাতিভেদ মানতেন না। হরিভক্তি ও জীবে দয়া ছিল তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোকই তাঁর শিষ্য ছিলেন।



শ্রীচৈতন্য

৩. সুলতানী আমলে শাসন ব্যবস্থা

সুলতানই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তিনি কোরানের পবিত্র অনুশাসন অনুসারে দেশ-শাসন করেন বলা হ'লেও তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী শাসক। তাঁর ইচ্ছাই ছিল আইন। কোন কোন সুলতান খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন সার্বভৌম শাসক। তাঁদের সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতানই ছিলেন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি বিচার-ব্যবস্থারও সর্বময় কর্তা ছিলেন। অবশ্য, বিচার-ব্যবস্থা কাজি-উস্-কজাত নামে প্রধান বিচারপতির অধীনে পরিচালিত হ'ত। মজলিশ-ই-খালোয়াত নামে সুলতানের এক দরবার থাকত। এতে আমীর-ওমরাহ্‌রা থাকতেন। রাজকার্য পরিচালনার জন্য উজির বা প্রধানমন্ত্রী থাকতেন। রাজকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ ছিল।

সাম্রাজ্য বিশ থেকে পঁচিশটি প্রদেশে বিভক্ত থাকত। প্রদেশগুলি সুলতান-নিযুক্ত শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হ'ত।

ঐসব শাসনকর্তাকে বলা হ'ত নায়েব-সুলতান। নায়েব-সুলতানরা এক-একটি খুদে সুলতান ছিলেন।

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ছিলেন কোতোয়াল। শহর বাসীদের কার্য-কলাপ, বাজার-দর, পণ্যের ওজন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য থাকতেন মুতাশিব নামে কর্মচারী।

সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু অধীন দেশীয় রাজ্য ছিল। দেশীয় রাজারা নিয়মিত সম্রাটের কাছে নজরানা পাঠাতেন এবং স্বাধীনভাবেই রাজ্য শাসন করতেন।

অনুশীলনী

১। ভারতে তুর্কী-আফগান আক্রমণের সূচনা কিভাবে হয়েছিল? গোড়ার দিকে এই আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

২। কিভাবে দিল্লীতে তুর্কী-আফগান সুলতানির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল?

৩। তুর্কী-আফগান সুলতানরা কতদিন ভারতে রাজত্ব করেছিলেন? ঐ সুলতানরা কোন্ কোন্ বংশের লোক ছিলেন? কোন্ সুলতানের সময়ে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল? কোন্ সুলতানের সময়ে ঐ সাম্রাজ্য প্রায় ভেঙে পড়েছিল?

৪। তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্যের কিভাবে পতন ঘটেছিল লিখ।

৫। তুর্কী-আফগান যুগে ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। টীকা লিখঃ কবীর, নানক, চৈতন্য, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মইনুদ্দিন চিশ্‌তি।

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন:

১। মহম্মদ ঘুরীর প্রকৃত নাম কি? কেন তাঁকে মহম্মদ ঘুরী বলা হয়?

২। তৃতীয় পৃথ্বীরাজ কে ছিলেন? তিনি কার হাতে পরাজিত হয়েছিলেন?

৩। দিল্লীর প্রথম তুর্কী-আফগান সুলতান কে?

৪। দিল্লীতে তুর্কী-আফগান সুলতানি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৫। দিল্লীর তুর্কী-আফগান সুলতানির পতন ঘটেছিল কবে?

৬। কার সময়ে তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল?

৭। সুফীবাদী দুইজন মুসলিম সাধুর নাম কর।

৮। কবীরের শিষ্যদের কি বলা হয়?

৯। নানকের শিষ্যরা কি নামে পরিচিত?

১০। চৈতন্যদেবের ধর্মের মূলকথা কি ছিল?

অবসান-মুখে মধ্যযুগ ১৪

নবযুগের সূচনা ঃ কোনও সমাজ ও উৎপাদন-ব্যবস্থা চিরকাল একরূপ থাকে না। মধ্যযুগের শেষের দিকে সমাজ ও উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। পথ-ঘাট ও যাতায়াত-ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটেছিল। ইউরোপে কৃষি, মেষপালন, পশম-উৎপাদন, পশমী ও সূতী বস্ত্রের উৎপাদন ও অন্যান্য নানারূপ শিল্পজাত-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রামীণ জীবন ছেড়ে মানুষ ক্রমেই শহরমুখী হয়েছিল এবং অসংখ্য ছোট-বড় শহর গড়ে উঠেছিল। এখন মানুষ আর কেবল সম্ভ্রান্ত, যাজক ও ভূমিদাস শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল না। সমাজে এখন বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটেছিল।

রাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান ঃ মধ্যযুগে যে সামন্ততন্ত্র প্রবল ছিল, তা নানা কারণেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ক্রুসেডের সময়ে বহু সম্ভ্রান্ত নিহত বা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ চলেছিল, তাতেও বহু সামন্ত নিহত হয়েছিলেন এবং বহু সামন্ত পরিবার লুপ্ত হয়েছিল।

মঙ্গোল আক্রমণের ফলে ইউরোপে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলনের ফলে মধ্যযুগের প্রধান

যোদ্ধা নাইটরা অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলে রাজারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এখন সম্ভ্রান্তদের ওপর তাঁদের নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছিল। তাঁরা উদ্ধত সম্ভ্রান্তদের দমন করে দেশে সুদৃঢ় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিষয়ে বুর্জোয়া বা শহুরে ধনিক শ্রেণী রাজাদের সহায়ক হয়েছিল।

কৃষক বিদ্রোহ ঃ ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সারা ইউরোপে এক ব্যাপক মহামারী দেখা দিয়েছিল। তা ইতিহাসে কালো মৃত্যু (Black Death) নামে কুখ্যাত হয়েছে। ঐ মহামারীতে কোটি কোটি মানুষ মরেছিল। ইংলণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। অন্যান্য জায়গাতেও মৃত্যুহার ভীষণ ছিল। ফলে দেশে কৃষক ও শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় কৃষকরা নানা সুযোগ-সুবিধার দাবি তুলেছিল। কিন্তু সামন্ত-প্রভুরা ও শাসক-শ্রেণী তাদের সুযোগ-সুবিধা না দেওয়ায় এবং তাদের পূর্ব অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করায় ইউরোপের বহুদেশে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে ফ্রান্সের জ্যাকারি নামে পরিচিত কৃষক বিদ্রোহ এবং ইংলণ্ডের ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব কৃষক বিদ্রোহ সামন্ততন্ত্রকে আরও কঠিন আঘাত দিয়েছিল।

জাতীয় চেতনা ও জাতীয় রাষ্ট্রসমুহের উদ্ভব ঃ ভাষার ভিত্তিতে নতুন নতুন জাতির উদ্ভব হয়েছিল। এখন রাষ্ট্রগুলিও জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছিল। ফ্রান্সের একাংশে ইংলণ্ড রাজত্ব করছিল; শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড বিতাড়িত হয়েছিল। ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী বারগাণ্ডির সামন্তরাজ ফ্রান্সের রাজার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে ফ্রান্সে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। স্পেন ও পর্তুগালে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। হল্যাণ্ড স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিল। এইভাবে সারা ইউরোপে জাতীয় চেতনা দেখা দিয়েছিল এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চলছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঃ মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণ-শিল্পের উন্নতি হওয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। মানুষ অন্ধ কুসংস্কার ছেড়ে কৌতূহল, চিন্তা ও যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছিল। তারা বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল এবং নব নব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। প্রাচ্যের ধন-সম্পদ তাদের আকৃষ্ট করেছিল। তারা প্রাচ্যের জলপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় ভৌগোলিক আবিষ্কারে মেতেছিল। ইউরোপ এখন আর ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা সমস্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পৃথিবীকে তাদের লীলাক্ষেত্র করতে চেয়েছিল।

কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন ঃ যখন ইউরোপে এইরূপ এক নব যুগের সূচনা হচ্ছিল, তখন একটি যুগান্ত-সূচনাকারী ঐতিহাসিক ঘটনাও ঘটেছিল। সেলজুক তুর্কীদের স্থলে এখন অটোমান তুর্কীরা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই তুর্কীদের দলনেতার পূর্বপুরুষের নাম ছিল ওসমান। তাই এরা ওসমান্‌লি বা অটোমান তুর্কী নামে পরিচিত।

অটোমান তুর্কীরা কন্‌স্টান্টিনোপলের চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অধিকার ক'রে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল এবং বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া অধিকার ক'রে আড্রিয়ানোপলে তাদের রাজধানী স্থাপন করেছিল। প্রথমে কন্‌স্টান্টিনোপলের নামমাত্র সম্রাটদের সঙ্গে তাদের সৌহার্দ্য থাকলেও তারা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপল অধিকার করল। এইভাবে রোম সাম্রাজ্যের চিহ্নও লুপ্ত হ'ল।

কন্‌স্টান্টিনোপলের পতনের ফলে গ্রীক ও রোমক পণ্ডিতরা মুসলিম-অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে ইউরোপে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। সূচনা হয় নবজাগৃতি বা রেনেসাঁসের। তাই কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন আধুনিক যুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। ঐ

বৎসরকে ইউরোপে মধ্যযুগের আরম্ভকাল বলা হয়। হাজার বছর পরে, ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন হ'লো। নানাকারণেই ঐ বৎসরকে ইউরোপে মহাযুগের অবসানকাল ব'লে ধরা হয়।

অনুশীলনী

১। মধ্যযুগের শেষভাগে সমাজে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল যা আধুনিক যুগের সূচনা করেছিল ?

২। অটোমান তুর্কী কাদের বলা হয় ? তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার ও কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। কন্‌স্টান্টিনোপলের পতনের ফলে কিভাবে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে নবযুগের সূচনা হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত বা মৌখিক প্রশ্ন ঃ

১। 'অটোমান তুর্কী' নাম হয়েছিল কেন ?

২। অটোমান তুর্কীরা কতো খ্রীষ্টাব্দে কন্‌স্টান্টিনোপল জয় করেছিল ?

৩। কোন্ সালকে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানকাল বলা হয় ?

কালপঞ্জি

খ্রীষ্টাব্দ	৩০৬	কন্‌স্টানটাইনের সিংহাসন-লাভ
"	৩৩০	কন্‌স্টান্টিনোপলের প্রতিষ্ঠা
"	৩৭৯	থিওডোসিয়াসের সিংহাসন-লাভ
"	৩৯৫	থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যু—রোম সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত
"	৪২০	অ্যালারিক কর্তৃক রোম অধিকার
"	৪২৯	গাইসেরিকের নেতৃত্বে ভ্যাণ্ডালদের আফ্রিকা অভিযান
"	৪৫২	এটিলার রোম আক্রমণ
"	৪৫৩	এটিলার মৃত্যু
"	৪৫৫	ভ্যাণ্ডালদের রোম আক্রমণ
"	৪৫৮	ভারতে প্রথম হূণ আক্রমণ
"	৪৭৬	পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন
"	৪৮০	সেণ্ট বেনেডিক্টের জন্মলাভ
"	৪৮১	ক্লভিসের ফ্রাঙ্ক-রাজ্য স্থাপন
"	৫২৭	জাস্টিনিয়ানের সিংহাসন-লাভ
"	৫৪৪	সেণ্ট বেনেডিক্টের মৃত্যু
"	৫৬৫	সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যু
"	৫৭০	হজরত মহম্মদের জন্ম
"	৬০৬	হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ
"	৬১৮	চীনে তাং সাম্রাজ্যের সূচনা
"	৬২২	হিজরত—হজরত মহম্মদের মদিনা-গমন
"	৬২৯	হিউয়েন সাংয়ের ভারতযাত্রা
"	৬৩২	হজরত মহম্মদের মৃত্যু
"	৬৪৮	হর্ষবর্ধনের মৃত্যু
"	৭৬৮	শার্লেমানের সিংহাসনলাভ
"	৮০০	শার্লেমান রোম-সম্রাট ঘোষিত
"	৮১৪	শার্লেমানের মৃত্যু

খ্রীষ্টাব্দ	৯৬০	চীন সুং-বংশীয়দের শাসনারম্ভ
„	৯৬২	অটো পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ঘোষিত
„	১০৯৫	পোপ আরবান কর্তৃক ক্রুসেডের ডাক
„	১০৯৯	খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধাদের জেরুজালেম জয়
„	১১৫৫	চেঙ্গিস খানের জন্ম
„	১১৬৯	সালাদিন মিশরের সুলতান
„	১১৮৭	সালাদিন কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার
„	১১৮৯	তৃতীয় ক্রুসেড
„	১২০৬	দিল্লীতে তুর্কী-আফগান সুলতানি আরম্ভ
„	১২১৪	চেঙ্গিস খান কর্তৃক উত্তর চীন অধিকার
„	১২১৮	চেঙ্গিস খানের খোয়ারিজম অভিযান
„	১২২৭	চেঙ্গিস খানের মৃত্যু ; ওগোতাই প্রধান খান
„	১২৫১	মঙ্গু মঙ্গোলদের প্রধান খান নির্বাচিত
„	১২৬০	কুবলাই খান মঙ্গোলদের প্রধান খান নির্বাচিত
„	১২৭১	মার্কো পোলোর চীন-যাত্রা
„	১২৮০	চীনে ইউয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা
„	১২৯১	কুবলাই খানের মৃত্যু
„	১২৯১	আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসনলাভ
„	১২৯৫	মার্কো পোলোর ভেনিসে প্রত্যাবর্তন
„	১৩৪৮	ইউরোপে ভয়ংকর মহামারী—কালো মৃত্যু
„	১৩৫৮	ফ্রান্সে কৃষক বিদ্রোহ—জ্যাকারি
„	১৩৮১	ইংল্যাণ্ডে কৃষক-বিদ্রোহ, ওয়াট টাইলারের মৃত্যু
„	১৩৯৮	তৈমূরলঙ্গের ভারত আক্রমণ
„	১৪৫৩	কনস্টাণ্টিনোপলের পতন
„	১৪৯৮	ভাস্কো ডা-গামার জলপথ আবিষ্কার ও ভারত আগমন
„	১৫২৬	দিল্লী সুলতানির পতন